তিন গোয়েন্দা সিরিজ

ছিনতাই

রকিব হাসান

Best viewed at 125%

ছিনতাই

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৮৮

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন।

সাউথ আমেরিকান এয়ারলাইনসের বিমানে চড়ল তিন গোয়েন্দা, সঙ্গে জরজিনা পারকার, যাবে দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনিরোতে। এবার ছুটিতে ব্রাজিল দেখবে ওরা। সমস্ত খরচ দিয়েছেন জিনার বাবা মিস্টার পারকার, এটা তার তরফ থেকে জিনার জন্মদিনের উপহার।

লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্লেনে নিউইয়র্ক এসেছে ওরা, এখানে প্লেন বদল করতে হয়েছে।

বসার জায়গা দেখিয়ে দিল সুন্দরী স্টুয়ার্ডেস।

সবাই হাসিখুশি, তবে জিনাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, রাফিয়ানের জন্যে দুশ্চিন্তা। মানুষের সঙ্গে একসাথে যাওয়ার নিয়ম নেই, প্লেনে জন্তু-জানোয়ারের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা।

স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞেস করল জিনা, 'আমার কুকুরটাকে ঠিকমত তোলা হয়েছে, জানেন?'

'কিচ্ছু ভেব না। তোমাদের মতই আরামে যাবে কুকুরটাও,' আরেকটা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল স্টুয়ার্ডেস।

আশ্বস্ত হলো জিনা। নরম গদিমোড়া সীটে আরাম করে হেলান দিয়ে চারদিকে তাকাল। জানালার ধারে বসেছে সে। তার পাশে মুসা আমান। ওদের পেছনের সীটে কিশোর পাশা আর রবিন মিলফোর্ড।

যাত্রীরা সব অল্পবয়েসী, কিশোর-কিশোরী, কিংবা আরও ছোট। স্কুল লেভেলের ওপরে কেউ নেই। সবারই ছুটি, কেউ পেয়েছে জন্মদিনের উপহার, কেউ বা পরীক্ষায় ভাল ফল করার প্রেজেন্ট—এই বেড়াতে যাওয়া।

হাসছে, কথা বলছে, উত্তেজনা আর খুশিতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে কেউ, কেউ বা গান ধরেছে বেসুরো গলায়। কোলাহল, কলরবে মুখর করে তুলেছে বিরাট বিমানের বিশাল কেবিন।

'খাইছে!' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম নাকিরে বাবা?'

খানিক পর সবাইকে সীট-বেল্ট বাঁধার নির্দেশ দিল স্টুয়ার্ডেস।

রানওয়েতে চলতে শুরু করল বিমান।

বিমান বন্দরের বড় বড় ভবনগুলো যেন ছুটতে লাগল জানালার পাশ দিয়ে।

আকাশে উঠল বিমান। যাত্রা হলো শুরু।

দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে এল শহর। নদী-নালা মাঠ-বন পেরিয়ে বেরিয়ে এল খোলা সাগরের ওপর। নিচে নীল আটলান্টিক।

শোনা গেল স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠ, চুপ করার অনুরোধ জানাচ্ছে। সিনেমা দেখানো হবে।

কেবিনের সামনের দিকে ওপর থেকে সাদা পর্দা নেমে এল। নিভে গেল আলো। ছবি শুরু হলো।

সিনেমা শেষে এল খাবার।

খেয়েদেয়ে আবার জাঁকিয়ে বসে গল্প শুরু করল কেউ, কেউ মিউজিক শুনতে লাগল, কেউ ঘুমিয়ে পড়ল, কেউ বা জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। দিগন্ত-জোড়া বিশাল এক নীল চাদর যেন বিছিয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে ছোট-বড় দ্বীপগুলোকে দেখাচ্ছে সবুজ ফুটকির মত। খুব সুন্দর।

স্যান স্যালভ্যাডরে নামল বিমান।

স্টুয়ার্ডেস জানাল, এখানে কিছুক্ষণ দেরি করবে প্লেন, যাত্রীরা ইচ্ছে করলে নেমে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আসতে পারে, চাইলে এয়ারপোর্ট ক্যাফেটেরিয়া থেকে কোকা কোলা কিংবা মিল্কশেক খেয়ে আসতে পারে। অনেকেই নামল।

তিন গোয়েন্দা বসে রইল, কিন্তু জিনা নামল। অনেকক্ষণ রাফিয়ানকে দেখেনি, আবার দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে তার। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে দেখে আসবে একবার।

ঠিকই বলেছে স্টুয়ার্ডেস, সত্যি, খুব আরামে রাখা হয়েছে কুকুরটাকে। তার কেবিনে রাফিয়ানই একমাত্র যাত্রী, আর কোন কুকুর কিংবা অন্য জানোয়ার নেই।

ফেরার পথে সরু গলিতে ধাক্কা লাগল একটা লোকের সঙ্গে। দোষটা কার বোঝা গেল না, দুজনেরই তাড়াহুড়ো। জিনা নাহয় উঠেছে কুকুর দেখতে, কিন্তু লোকটা কেন উঠেছে।

জিনা তাকে চেনে, নাম চ্যাকো। বাচ্চাদের দেখেশুনে রাখার জন্যে চারজন লোক দিয়েছে ট্র্যাভেল এজেন্সি, চারজন কেয়ার টেকার, চ্যাকো তাদের একজন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল চ্যাকো। 'দেখে চলতে পারো না?'

'আপনিও তো দেখে চলতে পারেন,' পাল্টা জবাব দিল জিনা।

ক্ষণিকের জন্যে জ্বলে উঠল লোকটার চোখ, তারপর জিনাকে অবাক করে দিয়ে হাসল। মাথা নাড়ল আপনমনেই। নেমে চলে গেল একটা সিগারেটের দোকানের দিকে।

ফিরে এসে বন্ধুদেরকে জানাল জিনা।

মুসা আর রবিন দুজন দুরকম মন্তব্য করল।

'ও কিছু না,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বাচ্চাকাচ্চা সামলানো, যা-তা ব্যাপার নাকি। সব তো বিচ্ছু। ওর জায়গায় হলে আমার মেজাজ আরও আগেই খারাপ হয়ে যেত।'

'কিন্তু তবু,' মেনে নিতে পারছে না জিনা, 'ওভাবে না ধমকালেও পারত।'

'পরে তো আবার হেসেছে,' মুসা বলল। 'তুমিও তো ভাল ব্যবহার করোনি। ধাক্কা মেরেছ, তারপর ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা, মুখে মুখে আবার তর্ক করেছ। তারপরও মেজাজ ঠাণ্ডা হচ্ছে না তোমার। কে বেশি বদমেজাজী? জিনা, কিছু মনে করো না, এ-কারণেই লোকে পছন্দ করে না তোমাকে।'

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল জিনা, 'ওই হারামীটার সঙ্গে আমার তুলনা করছ!'

'আহ্‌হা,' হাত তুলল কিশোর, 'গেল তো লেগে। জিনা এ-রকম যদি করো, আর কখনও তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।'

'কেন, মুসার দোষ দেখছ না? ও আমাকে বাজে কথা বলছে কেন?'

'বাজে বলছে কোথায়? ও-তো তোমাকে বোঝাচ্ছে।'

'থাক! অত বোঝার দরকার নেই আমার,' ঝটকা দিয়ে জানালার দিকে ফিরল সে, তাকিয়ে রইল বাইরে।

আবার ছাড়ল বিমান। নিচে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আলোকিত রাতের শহর। মাঝে আর কোন স্টপেজ ধরবে না, একেবারে রিও ডি জেনিরোতে গিয়ে নামবে প্লেন।

কমে এল কেবিনের শোরগোল, খানিক পরে থেমে গেল পুরোপুরি। হালকা মিউজিক আর নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জিনা এখনও।

মুসা সীটে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, রবিন ঢুলছে।

কিশোরের ঘুম আসছে না। একটা ম্যাগাজিন টেনে নিল। মন বসাতে পারল না। রেখে দিয়ে শেষে লোকগুলোর দিকে তাকাল। চারজন কেয়ার টেকার এক জায়গায় বসেছে।

চ্যাকো ব্যাটার চেহারা মোটেও ভাল না, ভাবছে কিশোর। মস্ত এক ষাঁড় যেন, গুঁতো মারার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। চারকোণা চোয়াল, আর কি বিচ্ছিরি চওড়া কপাল। ব্যাটার গায়ে মোষের জোর, সন্দেহ নেই, তবে মাথায় ঘিলু কম। বাচ্চাদের পাহারা দেয়ার জন্যে এমন একটা বাজে লোককে কি করে বাছাই করল এজেন্সি?'

দ্বিতীয় লোকটার নাম জিম। বয়েস বাইশের বেশি না। মোটামুটি সিরিয়াস লোক বলে মনে হলো কিশোরের। কারলোর মত ষাঁড় নয়, সুদর্শন। ধোপদুরস্ত পোশাক।

তৃতীয়জন ওরটেগা। বেঁটে, রোগা, চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী। ইংরেজিই বলছে, তবে তাতে কড়া বিদেশী টান, কথা বলার সময় খালি হাত নাড়ে।

'পর্তুগীজ নাকি?' ভাবছে কিশোর। 'ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগীজ। লোকটার কথায়ও পর্তুগীজ টান, ভাষাটা জানে বলেই বোধহয় তাকে বাছাই করা হয়েছে।'

চতুর্থ লোকটার নাম হেনরিক। কিশোরের মনে হলো, ওই একটিমাত্র লোক

সত্যিকারের কেয়ার টেকার, বাচ্চাদের কিভাবে সামলাতে হয় জানে। সারাটা দিন ওদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, ক্লান্ত হয়ে ঢুলছে এখন ওদের সঙ্গে সঙ্গে।

অন্য তিনজনের দিকে চোখ ফেরাল আবার কিশোর। তাদের চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। 'এত উত্তেজিত কেন ওরা?' ভাবল সে। 'কোন কিছুর অপেক্ষায় আছে?'

হাই তুলতে শুরু করল কিশোর।

হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেল তার। লাউডস্পীকারে বেজে উঠেছে ক্যাপ্টেনের গমগমে কণ্ঠ। 'গুড মর্নিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই রিও ডি জেনিরোতে নামছি আমরা। দয়া করে…'

কথা শেষ হলো না, থেমে গেল আচমকা, বিচিত্র কিছু ফিসফাস আর খুটখাট শোনা গেল স্পীকারে।

অবাক হলো কিশোর। কিসের শব্দ? যন্ত্রটন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন?

দেখল, চ্যাকো আর জিম নেই, ওরটেগা দাঁড়িয়ে আছে ককপিটের দরজার কাছে। পাহারা দিচ্ছে যেন। দৃষ্টি চঞ্চল, একবার কেবিনের দিকে তাকাচ্ছে, একবার দরজার দিকে।

তাজ্জব ব্যাপার তো! এমন করছে কেন?

একজন স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে কথা বলছে হেনরিক। দুজনকেই চিন্তিত মনে হচ্ছে। সারাক্ষণ লেগে থাকা হাসি উধাও স্টুয়ার্ডেসের মুখ থেকে। বার বার তাকাচ্ছে স্পীকারের দিকে, হঠাৎ থেমে যাওয়ার কারণ আন্দাজ করতে চাইছে।

শেষে আর থাকতে না পেরে বলল, 'যাই, দেখে আসি কি হলো?'

কিন্তু তাকে ককপিটে ঢুকতে দিল না ওরটেগা।

'যাওয়া যাবে না,' এত জোরে বলল, কেবিনের সবাই শুনতে পেল। 'সীটে গিয়ে বসুন।'

বোকা বনে গেল স্টুয়ার্ডেস। ঢোক গিলে বলল, 'কাকে কি বলছেন? যাওয়া যাবে না মানে? যান, সীটে গিয়ে বসুন। এখানে আসার অনুমতি নেই আপনার, বেআইনী কাজ করছেন।'

বিদ্রূপের হাসি ফুটল ওরটেগার ঠোঁটে। 'কেন বাজে বকছেন? যান, গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপ করে বসুন।'

মৃদু গুঞ্জন যেন ঢেউয়ের মত বয়ে গেল যাত্রীদের মাঝে।

ওরটেগার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা পিস্তল।

স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফেরাল সে নলের মুখ।

দুই

'কি করছেন আপনি, জানেন?' জোর নেই স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠে।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ওরটেগা।

ককপিটের দরজায় দেখা দিল চ্যাকো, তার হাতেও পিস্তল।

আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের। ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল, 'হাইজ্যাকার!'

গুঞ্জন বাড়ল। চেঁচিয়ে উঠল একজন। কি হচ্ছে, জানতে চায়। তার সঙ্গে গলা মেলাল আরও কয়েকজন।

লাফিয়ে উঠল হেনরিক। 'কি করছ? ভয় দেখাচ্ছ কেন ছেলেমেয়েদের। এসব রসিকতার কোন মানে হয়?'

এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে আবার তাকে বসিয়ে দিল চ্যাকো। 'না, হয় না। কিন্তু রসিকতা করছি না, এটা আসল। বসে থাকো চুপচাপ।'

তর্ক করে লাভ হবে না, বুঝল হেনরিক, আর কথা বাড়াল না।

আতঙ্কিত ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরল চ্যাকো। 'শোনা খোকাখুকুরা,' কর্কশ কণ্ঠ মোলায়েমের ব্যর্থ চেষ্টা করল, 'অনুমান করতে পারছ কিছু?'

'হাইজ্যাক!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'প্লেন হাইজ্যাক করেছ।'

মুসার বলার ধরন পছন্দ হলো না চ্যাকোর, হাসল বটে, কিন্তু চোখ দুটো শীতল। 'ঠিক ধরেছ। এখন ভাল-মন্দ তোমাদের ওপর। আমাদের কথা শুনলে কারও কোন ক্ষতি হবে না। যেখানে আছ, থাকো, যা করছিলে করো। গল্প করো, পড়ো, কিংবা মিউজিক শোনো।'

কেবিনে বেরিয়ে এল জিম।

তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল চ্যাকো, 'ওদিকে সব ঠিক আছে?'

'আছে। ক্যাপ্টেন, কো-পাইলট, রেডিওম্যান, কেউ গোলমাল করবে না।'

'কি করেছ ওদের?' আবার সীট থেকে উঠতে শুরু করল হেনরিক।

'বসো,' পিস্তল নাচাল চ্যাকো।

'মারিনি, বেঁধে রেখেছি। যাতে নড়তে না পারে,' জিম বলল।

'তাহলে কি···'

'হ্যাঁ, অটোমেটিক পাইলটে চলছে প্লেন। এখানকার অবস্থা দেখতে এসেছি। সবাইকে শান্ত করে গিয়ে কন্ট্রোল হাতে নেব। আমিই চালাব প্লেন। চ্যাকো, সরাও।'

সীটের মাঝের গলিপথে আর কেবিনের পেছনে স্থির হয়ে আছে স্টুয়ার্ড-স্টুয়ার্ডেসরা। ওরটেগারের কাছে দাঁড়ানো একজন স্টুয়ার্ডেসের কাছে এগিয়ে গেল চ্যাকো। পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'হাঁটো।'

বাথরুম আর রান্নাঘরে বিমানের সমস্ত কর্মচারীদের আটকে রেখে এল হাইজ্যাকাররা। তারপর জিম চলে গেল ককপিটে।

'চালাতে পারবে তো?' বিদ্রূপের হাসি ফুটল ওরটেগার ঠোঁটে। কিশোর বুঝল ওরকম করেই হাসে লোকটা।

'পারবে তো বলল,' জবাব দিল চ্যাকো।

'পারলে ভাল। আমাদের জীবন এখন ওর হাতে। হালকা টুরিস্ট প্লেন ছাড়া আর তো কিছু চালায়নি। এতবড় প্লেন সামলাতে পারলে হয়।'

কড়া চোখে তাকাল চ্যাকো। 'বেশি কথা বলো। জিম যখন বলেছে চালাতে পারবে, পারবেই। খামোখা ভয় দেখাচ্ছে বাচ্চাগুলোকে।'

হাইজ্যাকারদের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না জিনা। রোমাঞ্চ ভাল লাগে তার। ভয় পায়নি। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রথম চমকটা কেটে গেছে। শত্রুদের ভালমত লক্ষ করছে এখন জিনা। চ্যাকোকে শুরুতে ভাল লাগেনি তার, নিষ্ঠুর মনে হয়েছে, কিন্তু এখন যতখানি খারাপ লাগছে না। আসলে দেখে যতটা মনে হয়, তত খারাপ নয় বিশালদেহী লোকটা।

একটু আগের কথা কাটাকাটির কথা বেমালুম ভুলে গেল জিনা, আস্তে করে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল মুসার গায়ে। 'কি ভয় পাচ্ছ?'

'ভয়? হ্যাঁ, তা-তো পাচ্ছিই। কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।'

'কি মনে হয়? দারুণ একখান অ্যাডভেঞ্চার হবে, না?'

'তোমার কাছে দারুণ লাগছে। আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। হাইজ্যাকারদের বিশ্বাস নেই। আর আমরা এখানে ভাল থাকলেই কি? বাবা-মা চিন্তা করবে না?'

'মুসা ঠিকই বলেছে,' পেছন থেকে বলল কিশোর। 'রেডিও অপারেটরকে বেঁধে রেখেছে। রিওর কন্ট্রোল টাওয়ার নিশ্চয় যোগাযোগের চেষ্টা করছে প্লেনের সঙ্গে। জবাব পাবে না।'

'হ্যাঁ,' রবিন একমত হলো। 'হাইজ্যাকের খবর সব সময়ই খবরের কাগজের হেডলাইন হয়। খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়বে খবর। বাবা, মা, সাংঘাতিক দুশ্চিন্তা করবে।'

'আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত ওরা কি করবে বলো তো?' জিনা বলল। 'ইস্, রাফিয়ান এখন এখানে থাকলে হত। ওরটেগা আর চ্যাকোকে কাবু করে ফেলতে পারতাম। আবার সব ঠিক হয়ে যেত।'

জবাব দিল না তিনজনের কেউ।

বেশি অবাস্তব কল্পনা করছে জিনা। কিন্তু কিশোর আন্দাজ করতে পারছে, কতখানি বিপদে পড়েছে ওরা। প্লেনের সমস্ত কর্মচারী আর যাত্রী এখন হাইজ্যাকারদের হাতের পুতুল, যেভাবে বলা হবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের গুঞ্জনে মনে হচ্ছে, হাজার হাজার মৌমাছি এনে ছেড়ে দেয়া

হয়েছে কেবিনে। কেউ আস্তে কথা বলছে, কেউ জোরে। বেশি বাচ্চা কয়েকজন ফোঁপাচ্ছে নিচুস্বরে, থামানো যাচ্ছে না কিছুতেই।

সব আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল চ্যাকোর কর্কশ কণ্ঠ, 'এই, চুপ! শুনছ? চুপ! শোনো, আমার কথা শোনো।'

থেমে গেল গুঞ্জন।

'তোমাদের কারও কিচ্ছু হবে না,' বলল চ্যাকো। 'কি করব, সেটা পরে বলছি। কেন করেছি সেটা আগে শোনো। প্লেনটা আমাদের দরকার। কিছু মাল নিরাপদে কলাম্বিয়ায় পার করতে চাই। কাস্টমস গোলমাল করবে, তাই…'

'সোজা করে বলো না,' বাধা দিয়ে বলল ওরটেগা, 'কিছু মাল স্মাগল করব আমরা।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল বাচ্চাদের। শুধু হাইজ্যাকারই নয়, চোরাচালানীর পাল্লায় পড়েছে ওরা।

'টাকা নেই আমাদের,' বলে গেল চ্যাকো। 'ভাড়ার পয়সাও নেই। ভাবলাম, একটা প্লেন হাইজ্যাক করতে পারলে কাজ হয়। ঝুঁকিটা নিয়েই ফেললাম। তিনজন কেয়ার টেকারের কাগজপত্র জাল করে তাদের বদলে আমরা উঠেছি, আসল লোকেরা রয়ে গেছে নিউইয়র্কে, এয়ারপোর্টের এক বাথরুমে, আটক। তাই কোন অসুবিধে হয়নি। সন্দেহ হয়নি কারও। বুঝতে পারছি, সফল হব, তবে তার জন্যে তোমাদের সহায়তা দরকার।'

'বাহ্, বড় বেশি আত্মবিশ্বাস দেখছি,' বলে উঠল হেনরিক। 'আমাকে আটকাওনি কেন?'

'তোমাকে এখানে দরকার ছিল। কেয়ারটেকারের ট্রেনিং আছে তোমার, আমাদের নেই। সবাই আনাড়ি হলে মুশকিল। ধরা পড়ে যেতাম,' বলল ওরটেগা।

'নতুন কাজ নিয়েছি ওই ট্রাভেল এজেন্সিতে,' বলল হেনরিক। 'এ-লাইনে এটাই প্রথম সফর। অন্য তিনজনকে চিনি না বলেই করতে পারলে।'

'সে-জন্যেই তো তোমাকে বেছে নিয়েছি,' দরাজ হাসি হাসল চ্যাকো। 'যাকগে। ছেলেরা, যা বলছিলাম। রিওতেই নামব আমরা।'

রিও ডি জেনিরোতে প্লেন নামলে বাঁচার কোন উপায় হয়েও যেতে পারে, ভাবল মুসা।

'নামব,' বলে যাচ্ছে চ্যাকো, 'প্লেনের তেল নেয়ার জন্যে। আর কিছু খাবারও দরকার আমাদের। কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলছে ক্যাপটেন, আমাদের কি কি দরকার, জানাচ্ছে। নেমে সব তৈরিই পাব আমরা। এখন আসছি আসল কথায়। শুধু বিমানটা দরকার আমাদের। এর স্টাফ আর যাত্রীদের নামিয়ে দেয়াই বরং আমাদের জন্যে নিরাপদ, ঝামেলা অনেক কমে যাবে।'

ওরটেগা হয়তো ভাবল, এরপরের বিশেষ কথাগুলো তার নিজের বলা দরকার, তাই চ্যাকোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কাজেই, তোমাদের কোন ভয়

নেই। তোমরা গোলমাল না করলে আমরাও করব না। নামিয়ে দেব জায়গামত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যাত্রীরা। গুঞ্জন শুরু হলো।

নিচু কণ্ঠে বন্ধুদের বলল মুসা, 'ব্যাটারা পাগল, বদ্ধ উন্মাদ! যাত্রীদেরকে নামিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনে উঠবে পুলিশ।'

'আমার তা মনে হয় না,' কিশোর বলল। 'এত সহজ নয় ব্যাপারটা। এসব ভাবেনি, এত বোকা নয় ওরা। কোন মতলব নিশ্চয় আছে।'

জানা গেল শিগগিরই।

'তবে,' হাত তুলল চ্যাকো, গুঞ্জন থামানোর জন্যে 'নিজেদের নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে আমাদের। তাই, অন্তত একজন জিম্মি রাখতে হবে।'

'জিম্মি' শব্দটা শুনেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল যাত্রীদের মুখ। কার পালা?

'জিনা, হুঁশিয়ার!' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'তোমার দিকে তাকাচ্ছে।'

কালো হয়ে গেল জিনার মুখ। চোখের পাতা কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে।

সরাসরি জিনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চ্যাকো। হাসল। তারপর এগিয়ে এল ধীরে পায়ে।

'এই, তুমি উঠে এসো,' ডাকল চ্যাকো।

নড়ল না জিনা।

'কি হলো? আসছ না কেন? জলদি এসো।'

উঠল না জিনা।

এগোল চ্যাকো।

হাত তুলল মুসা। 'দাঁড়ান। জিম্মি হলেই তো হয় আপনাদের। আমি, আসছি।'

পেছন থেকে বলে উঠল রবিন, 'ওরা থাক। আমাকে নিন।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। গভীর চিন্তা চলছে মাথায়।

উঠে দাঁড়াল জিনা, 'না না, কারও দরকার নেই। আমিই আসছি।'

ভুরু কুঁচকে গেছে চ্যাকোর। 'হ্যাঁ, তুমিই এসো। ছেলেদের দরকার নেই আমার। জিম্মি হিসেবে সুন্দরী কিশোরী খুব ভাল হবে। ছবি আর খবর ছাপা হলে নাড়া দেবে সবাইকে।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর, ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। 'মিস্টার চ্যাকো, আরেক কাজ করলে তো পারেন। আমরা চারজন এক জায়গা থেকে একই সঙ্গে বেরিয়েছি, আমাদের চারজনকেই নিন। জিম্মি বেশি হলেই তো বরং আপনাদের সুবিধে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল চ্যাকো। কি করবে বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না দেখে শেষে রেগে গেল নিজের ওপরই। ধমক দিয়ে বলল, 'বড় বেশি ফ্যাচফ্যাচ করছ তোমরা। এটা কি সিনেমা পেয়েছ নাকি? বেশি জিম্মি রাখলে ঝামেলা বেশি, একজনকেই রাখব। যাকে নেব ঠিক করেছি, তাকেই শুধু। এই মেয়ে, এসো।'

মুসার সামনে দিয়ে গলিতে বেরিয়ে এল জিনা।

তার হাত ধরতে গেল চ্যাকো।

ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল জিনা। 'খবরদার, ষাঁড়, গায়ে হাত দেবে না! চলো, কোথায় যেতে হবে।'

পিস্তলের ইশারায় ককপিট দেখাল চ্যাকো। 'ওখানে। জিমের পাশে চুপ করে বসে থাকবে।'

ককপিটের দরজা খুলে দিল ওরটেগা। জিনা ভেতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ করে দিল।

'শোনো তোমরা,' যাত্রীদের বলল চ্যাকো, 'সীট-বেল্ট বেঁধে নাও। একটু পরেই ল্যাণ্ড করব। কোন চেঁচামেচি নয়, ধাক্কাধাক্কি নয়। সিঁড়ি দিয়ে একজনের পেছনে একজন নেমে যাবে, শান্তভাবে। আমি আর ওরটেগা পিস্তল নিয়ে পেছনে থাকব। কেউ শয়তানী করলেই গুলি খাবে। পুলিশকে বলবে, ওরা কিছু করার চেষ্টা করলে জিম্মি মেয়েটা মরবে। বুঝেছ? আই রিপীট, মরবে!'

তিন

নীরবে সীট-বেল্ট বেঁধে নিল যাত্রীরা।

এঞ্জিনের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, টুঁ শব্দ করল না কেউ। নিজেদের কথা ভাবছে ওরা, জিনাকে নিয়ে চিন্তিত নয়—তিন গোয়েন্দার কথা অবশ্য আলাদা। বিপদ যে সামান্যতম কমেনি, এটা বোঝার বুদ্ধি আছে ছেলেমেয়েদের। জিম যদি ঠিকমত প্লেন ল্যাণ্ড করাতে না পারে? যদি ক্র্যাশ করে? যদি নামার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাতে শুরু করে পুলিশ?

নিচে রানওয়ে আর বিমান বন্দরের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে।

নামতে শুরু করল প্লেন। সবাই চুপ। প্রচণ্ড উত্তেজনা। ঠাণ্ডা এয়ারকুলড কেবিনেও দরদর করে ঘামছে অনেকে।

অবশেষে নিরাপদেই নামল বিমান। চারপাশ থেকে ছুটে এল অসংখ্য মূর্তি। তাদের মাঝে ইউনিফর্ম পরা পুলিশও রয়েছে।

রেডিওতেই সমস্ত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে হাইজ্যাকাররা। প্লেনের ধারেকাছে যাতে কোন গাড়ি না আসে, বলে দিয়েছে। গাড়ি এল না। পুলিশদের হাতেও কোন অস্ত্র নেই। একটা বিশেষ দূরত্বে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

পরিকল্পনা মাফিকই হচ্ছে সব কিছু। একে একে নেমে গেল ছেলেমেয়েরা, খালি হাতে। তাদের মালপত্র সব রয়ে গেল বিমানে।

বিমানের কর্মচারীদের মুক্তি দেয়া হলো। তারাও নেমে গেল একে একে। কেউ কোন গোলমাল করল না। চ্যাকোর হাতে পিস্তল। ওরটেগা একটা সাব-মেশিনগান বের করে নিয়েছে। তার ওপর ককপিটে জিম্মি রাখা হয়েছে এক কিশোরীকে।

কাজেই কিছু করার চেষ্টা করল না কেউ।

খুব ধীরে ধীরে কাটছে জিনার সময়। দুঃস্বপ্নের মাঝে রয়েছে যেন সে। জিমের পাশে বসে ভাবছে, এরকম বিশ্রী অবস্থায় জীবনে কখনও পড়েনি। এখন পর্যন্ত খারাপ কিছু করেনি হাইজ্যাকাররা, কিন্তু চাপে পড়লে করবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়?

জিনাকে অবাক করে দিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল জিম। আলতো চাপ দিয়ে বলল, 'মন খারাপ কোরো না। কোন ক্ষতি হবে না তোমার। দিন কয়েকের মধ্যেই মুক্তি দেয়া হবে।' হাসল সে। 'আমরা অমানুষ নই। বেআইনী কাজ হয়তো করছি, কিন্তু খারাপ লোক নই।'

'জেনেশুনে তাহলে করছেন কেন?'

'একবার খারাপ পথে পা দিলে, ফেরার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। একটা প্রাইভেট অ্যাভিয়েশন ক্লাবের ইনস্ট্রাকটর ছিলাম। গাধার মত একদিন ওখানকার ক্যাশ চুরি করে বসলাম। তারপর থেকে জড়িয়ে পড়লাম নানারকম অপরাধের সঙ্গে, আর ফিরতে পারলাম না। এখন তো অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে।'

'কে বলল? আমার তা মনে হয় না। ইচ্ছে করলে এখনও ফিরতে পারেন, সময় আছে,' নরম গলায় বলল জিনা। 'সত্যি বলছি, যদি হাইজ্যাকার না হতেন, চোরাচালান না করতেন, আপনাকে আমি পছন্দই করতাম।'

হাসল শুধু জিম, জবাব দিল না। সামনে ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। কি হচ্ছে, দেখল।

'একটু বাদেই উড়ব আবার,' বলল সে। 'আমাজনে প্লেন নিয়ে যেতে পারব আশা করছি। ওখানে ল্যাণ্ড করব। অস্থায়ী একটা রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে ওখানে।' একটু থেমে যোগ করল, 'আমাদের বন্ধুরা কাছেই থাকবে। অনেকদিন থেকেই ওরা স্মাগলিঙের সঙ্গে জড়িত।'

অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল জিনা। যে কোন মুহূর্তে রিও ছাড়বে প্লেন, একা হয়ে যাবে তখন। বন্ধুদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। হঠাৎ করেই মনে পড়ল রাফিয়ানের কথা। আছে তো, না তাকেও নামিয়ে দিয়েছে? রাফিয়ান সঙ্গে থাকলে অনেক ভরসা পায় জিনা, বিপদে-আপদে সাহায্য পাবে।

জানালা দিয়ে দেখছে জিনা, বাইরে সবাই ব্যস্ত। অসংখ্য পুলিশ ঘিরে রেখেছে প্লেনটাকে, কিন্তু বিষদাঁত ভাঙা সাপের অবস্থা হয়েছে ওদের, কিছুই করতে পারছে না। অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্লেনে তেলভরা দেখছে শুধু।

বিমানের কর্মচারী আর যাত্রীরা ঢুকে যাচ্ছে এয়ারপোর্টের মেইন বিল্ডিঙে, তাদেরকে ঘিরে রয়েছে এক ঝাঁক রিপোর্টার। নিশ্চয় তাদের মাঝেই রয়েছে কিশোর, মুসা আর রবিন।

আচ্ছা, কিশোর কি করছে? এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার ছেলে তো সে নয়। ক্ষীণ আশা হলো জিনার, কিশোর যখন মুক্ত রয়েছে, কিছু একটা সে করবেই।

জিনাকে উদ্ধার করার সব রকম চেষ্টা চালাবে, বুদ্ধি একটা ঠিক বের করে ফেলবে।

মুসা আর রবিনের কথা ভাবল। কি একেক জন সোনার টুকরো ছেলে। তাকে বাঁচানোর জন্যে স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে বিপদে ঠেলে দিতে চেয়েছিল। আর সে কিনা ওদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সারাক্ষণ ঝগড়া বাধিয়ে রাখে।

বাবা-মার কথা মনে পড়তেই চোখে পানি এসে গেল জিনার। তাঁরা ওকে কত ভালবাসেন, অথচ সে খারাপ ব্যবহার করে তাঁদের সঙ্গে। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জিনা, আর কারও সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করবে না। ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ভাল হওয়ার কথা তো পরে, আগে এখান থেকে বেরোতে তো হবে। মুক্তি পেলে তবে না···

ককপিটে ঢুকল চ্যাকো, তার পেছনে ওরটেগা।

'এবার যাওয়া যায়, জিম,' চ্যাকো বলল।

রানওয়েতে চলতে শুরু করল প্লেন। দুরুদুরু করছে জিনার বুক। সময় অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে।

অবশেষে মাটি ছাড়ল প্লেন, দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল।

জিম ঘোষণা করল, 'অলটিচিউড বারো হাজার মিটার। স্পীড এক হাজার কিলোমিটার।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল চ্যাকো আর ওরটেগা।

'সেরে দিলাম কাজ!' হাসি ফুটল ওরটেগার মুখে। 'নিরাপদ। জিনাকে ধন্যবাদ। ওর জন্যেই কেউ পিছু নিতে সাহস করবে না।'

জিনাকে বলল চ্যাকো, 'ইচ্ছে করলে ঘোরাঘুরি করতে পারো। বলেছি না, তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

কেবিনের দরজা খুলে দিল সে।

জিনা বেরোল। চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা! তোমরা এখানে!'

চিৎকার শুনে দরজায় উঁকি দিল চ্যাকো। তাজ্জব হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই ছেলে তিনটে, জিনার বন্ধু। বোধহয় সীটের নিচে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। বেশ খুশি খুশি লাগছে ওদের।

'যাওনি?' কেবিনে ঢুকল চ্যাকো।

'নাহ্,' যেন কিছুই না এমনি ভঙ্গিতে বলল কিশোর। জিনাকে দেখিয়ে বলল, 'ও রয়ে গেছে। ফেলে যাই কি করে?'

'ছিলে কোথায়?'

'সীটের নিচে।'

'হুঁ, এত ব্যস্ত ছিলাম, গুণে দেখার কথা মনে হয়নি। তাছাড়া ভাবতেও পারিনি, ঝুঁকি নিয়ে কেউ রয়ে যাবে প্লেনে। শুধু বন্ধুর সঙ্গে থাকার জন্যেই রয়ে গেলে?'

'একসঙ্গে বেরিয়েছি,' রবিন বলল, 'একসঙ্গে যাব। বিপদের মোকাবেলা করতে হলেও একসঙ্গেই করব। একা রেখে গেলে ওর বাপ-মাকে গিয়ে কি জবাব দেব?'

প্রশংসা ফুটল চ্যাকোর চোখে। 'কাজটা বোধহয় ভাল করলে না। যাকগে, আমাদের কি? ঝামেলা বাড়ল বটে, কিন্তু সুবিধেও হলো।' নিজেকে বোঝাচ্ছে সে। 'একজন জিম্মির চেয়ে চারজন···'

'পাঁচ,' শুধরে দিল জিনা। 'যদি রাফিয়ানকে নামিয়ে না দিয়ে থাকেন?'

'রাফিয়ান?' কুঁচকে গেল চ্যাকোর ভুরু।

'আমার কুকুর। আপনার সঙ্গে যে ধাক্কা লাগল, ওকেই তখন দেখতে গিয়েছিলাম। আপনি গিয়েছিলেন কেন?'

হাসল চ্যাকো। 'জানোয়ারের ঘরের পাশেই বিমানের ভাঁড়ার। অস্ত্রপাতিগুলো ওখানেই রেখেছিলাম।'

আর কিছু না বলে ককপিটে চলে গেল সে। জিম আর ওরটেগাকে খবরটা জানানোর জন্যেই হয়তো।

কিশোরের হাত ধরল এসে জিনা। 'থ্যা-থ্যাংকিউ···'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'যেন শুধু কিশোরই থেকেছে। আমরা থাকিনি?'

হাসল জিনা। মুসা আর রবিনেরও হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিল। ধন্যবাদ দিল বার বার। ওরা রয়ে যাওয়ায় সে কৃতজ্ঞ বোধ করছে, জানাল নির্দ্বিধায়।

সহজ হয়ে গেল পরিবেশ।

পরের কয়েক ঘণ্টায় হাইজ্যাকারদের সঙ্গেও সম্পর্ক সহজ করে নিল চার অভিযাত্রী। বাবুর্চি আর স্টুয়ার্ডের দায়িত্ব নিল চ্যাকো। ট্রেতে খাবার সাজাতে গিয়ে ভুলভাল করে ফেলল। হেসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। দুজনে মিলে খাওয়া সরবরাহ করল সবাইকে।

জিমের পাশে খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখল রবিন।

'থ্যাংকস,' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে জিম। 'অন্ধকার হয়ে যাবে শিগ্গী। তখন আর খেতে পারব না। এতবড় প্লেন এর আগে কখনও চালাইনি তো, সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হচ্ছে।'

'তিনজনের কাজ একা করছ, আর কি?' সাহস দিল ওরটেগা। 'ভালই তো চালাচ্ছ।'

'আরও কয়েক ঘণ্টা লাগবে,' চ্যাকো বলল। 'পারবে তো?'

'চেষ্টা তো করতেই হবে,' বলল জিম। 'রেডিওতে যোগাযোগ করতে হবে ওদের সঙ্গে। নামার নির্দেশ চাইব। না না, এখন না, আরও অনেক পরে।'

'আমাদের কখন যেতে দেবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আমাজনের ওদিকে তো ঘোর জঙ্গল। সভ্য লোকালয় আছে?'

'ভেব না,' জবাব দিল ওরটেগা। 'জঙ্গলের মাঝে মিশনারিদের ক্যাম্প আছে। ওখানে দিয়ে আসব। ওরাই তোমাদের পৌঁছে দেবে লোকালয়ে।'

সংবাদটা বিশেষ আশাব্যঞ্জক মনে হলো না ছেলেদের কাছে, কিন্তু কি আর করা। এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

রাত নামল। জিনা বলল, 'এসো, ঘুমাই। দুশ্চিন্তা কমবে।'

কেবিনের সীটে বসে ঘুমানোর চেষ্টা করল ওরা।

সবাই ঘুমাল, কিন্তু জিনার চোখে ঘুম নেই। রাফিয়ানের কথা ভাবছে। কয়েকবার চ্যাকোকে অনুরোধ করেছে সে, রাফিয়ানকে কেবিনে নিয়ে আসার জন্যে। রাজি হয়নি চ্যাকো, কুকুর পছন্দ করে না।

সামনের দিকে একটা সীটে চ্যাকোর নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল জিনা। চুপি চুপি চলল কেবিনের পেছন দিকে।

তখন প্লেনের পেছনের দরজা দিয়ে উঠেছিল রাফিয়ানের কামরায়। এদিকের পথ চেনে না। কিন্তু থামল না জিনা। একের পর এক দরজা খুলে উঁকি দিতে লাগল ভেতরে। ভাঁড়ারটা পেল। চ্যাকো বলেছে, ভাঁড়ারের সঙ্গেই রয়েছে জন্তু-জানোয়ারের ঘর।

কি করে জানি টের পেয়ে গেল রাফিয়ান, জিনা কাছাকাছি রয়েছে। বোধহয় গন্ধ পেয়েছে। চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল সে।

দরজা খুলে ছুটে গিয়ে রাফিয়ানের গা ঘেঁষে বসে পড়ল জিনা। পিঠে হাত বুলিয়ে, মাথায় আলতো চাপড় দিয়ে আদর করতে লাগল। 'রাফি, কষ্ট পাচ্ছিস? তোর তো পাওয়ার কথা না। আরামেই আছিস। আমরাও অবশ্য খুব একটা খারাপ নেই, হাইজ্যাকাররা লোক ভাল। বুঝলি রাফি, এবার আর কোন রহস্যের সমাধান নয়। অ্যাডভেঞ্চার, পিওর অ্যাডভেঞ্চার।'

'হউ!' লেজ নেড়ে বলল রাফিয়ান, একমত হলো যেন জিনার কথায়। 'হউ! হউ!'

রাফিয়ানের মুখের দিকে তাকাল জিনা। 'ঠিক বলেছিস। অ্যাডভেঞ্চার মানেই অ্যাকশন। দাঁড়া, আগে নেমে নিই। তোর সাহায্যে হাইজ্যাকারদের ফাঁকি দিয়ে পালাব আমরা। ও হ্যাঁ, কিশোর, মুসা আর রবিনও আছে। আমাদের ছেড়ে যায়নি।'

'হউ!' বলল আবার রাফিয়ান।

কুকুরটার বাঁধন খুলে দিল জিনা। তাকে নিয়ে ফিরে এল কবিনে। কিন্তু নিজের সীটে পৌঁছার আগেই ভীষণভাবে দুলে উঠল বিমান। তাল সামলাতে না পেরে, উল্টে পড়তে পড়তে একটা সীট খামচে ধরে সামলে নিল সে কোনমতে।

'হলো কি?' সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল জিনা।

জেগে গেছে চ্যাকো। লাফিয়ে উঠল।

ধাক্কার চোটে তিন গোয়েন্দাও জেগে গেল।

আবার কেঁপে উঠল বিমান, গা ঝাড়া দিচ্ছে যেন দুরন্ত ঘোড়া।

ককপিটের দিকে ছুটল চ্যাকো। ছেলেরা পিছু নিল।

রেডিওর কাছ থেকে উঠে গিয়ে জিমের পাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ওরটেগা, নজর কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে। নিয়ন্ত্রণ নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে জিম।

'কি হলো?' জিম উদ্বিগ্ন।

ফিরে তাকাল না জিম। এই সময় আবার কেঁপে উঠল প্লেন, প্রচণ্ডভাবে। সামান্য কাত হয়েই আবার সোজা হলো। 'কি জানি, বুঝতে পারছি না,' দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে সে। 'কিছু একটা···'

কথা শেষ করতে পারল না, দুলে উঠল বিমান ভীষণভাবে।

সোজা করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল জিম, কিন্তু এবার আর ঠিক হতে চাইছে না বিমান। 'গোলমাল একটা কিছু হয়েছে। কি, বুঝতে পারছি না। চালানোয় কোন ভুল হয়নি আমার।'

চ্যাকো আর ওরটেগার মুখ কালো। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে যেন ছেলেরা। রাফিয়ান ও উদ্বিগ্ন, অদ্ভুত কোন উপায়ে টের পেয়ে গেছে বিপদ।

'মরব না তো, জিম?' ওরটেগার গলা কাঁপছে। 'নামাতে পারবে তো?'

'কন্ট্রোল কথা শুনতে চাইছে না,' জিম জানাল। 'খারাপের দিকেই যাচ্ছে।' জোর নেই গলায়। 'জাদু তো আর জানি না, অলৌকিক কিছু ঘটাতে পারব না।'

ঝাঁকুনি দিয়ে নাক নিচু করে ফেলল প্লেন। গাঢ় অন্ধকারে শাঁ শাঁ করে মাটির দিকে ছুটে চলল।

চুপ করে রয়েছে ছেলেরা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। নিজেদের অজান্তেই একে অন্যের হাত ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন শক্তি সঞ্চয় করছে। রাফিয়ান জিনার পা ঘেঁষে রয়েছে।

কন্ট্রোলের ওপর আরও ঝুঁকে গেছে জিম। তার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চ্যাকো আর ওরটেগা, আতঙ্কিত।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেরোল, কিন্তু ওদের মনে হলো, কয়েক যুগ।

অবশেষে মাথা সোজা করল জিম। 'জলদি গিয়ে সীটে বসে সীট-বেল্ট বাঁধো। ক্র্যাশ-ল্যাণ্ড করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। চলেছে জঙ্গলের ওপর দিয়ে, নামতে পারলে হয় এখন,' গোপন না করে সত্যি কথাই বলল সে।

সবাই বুঝল, বাঁচার আশা কম।

'আরে, মুখ অমন কালো করে রেখেছ কেন?' হাসার চেষ্টা করল কিশোর, সীট-বেল্ট বাঁধছে। 'আগেও বিপদে পড়েছি, উদ্ধারও পেয়েছি, নাকি?'

'কই, কালো কই? এই তো হাসছি,' কিন্তু জিনার হাসিটা কান্নার মত দেখাল।

সাধ্যমত চেষ্টা করছে জিম। অলটিমিটারের ওপর চোখ, প্লেনের নাক সোজা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সোজা হলে গতি অন্তত সামান্য কমবে, তাতে নাক সোজা করে মাটিতে গিয়ে গাঁথবে না প্লেন।

কিন্তু কথা শুনল না প্লেন, খামখেয়ালির মত চলেছে। নাক তো সোজা করলই না, বিপদ আরও বাড়ানোর জন্যেই যেন বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল একপাশে। কোথায় যাচ্ছে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না জিম।

পাহাড়-টাহার নেই তো? তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না। পাহাড়ের

ধাক্কা খেলে···আর ভাবতে পারল না সে।

পরের কয়েকটা মুহূর্ত ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মাঝে কাটল যেন ওদের। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সামনে ঝুঁকে গেল সবাই, টান টান হয়ে গেল সীট-বেল্ট। আরও কাত হয়ে পুরো আধচক্কর ঘুরল বিমান, সোজা হলো সামান্য, পরক্ষণেই তার ধাতব শরীর ছেঁড়ার তীক্ষ্ণ চড়চড় শব্দ কানে এল। আরেকবার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল—নাক নিচে, লেজ ওপরে তুলে।

আরও কয়েক মুহূর্ত কেউ নড়ল না।

সবার আগে সামলে নিল জিনা। না না, ভুল হলো, রাফিয়ান। তাকে কোলে নিয়ে দুহাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে জিনা। তার গাল চেটে দিল কুকুরটা। লেজ নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'খউ! খউ!'

'রাফি, সব ঠিক হয়ে গেছে, না?' দুর্বল লাগছে জিনার, সারা শরীর কাঁপছে। রাফিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে কাঁপা হাতে বেল্ট খুলল। ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলো নিভে গেছে। অন্যেরা ঠিক আছে তো?

এই সময় সাড়া দিল মুসা, 'আল্লাহ্‌রে! দুনিয়ায় আছি, না দোজখে?'

'মুসা, তুমি ভাল আছ?' উৎকণ্ঠায় ভরা জিনার কণ্ঠ।

'তা আছি। তবে দুনিয়াতে, না আল্লাহ্‌র কাছে, বুঝতে পারছি না। তুমি?'

'দুনিয়াতেই আছ। আমি ভাল। কিশোর আর রবিনের কি খবর?'

ওরাও সাড়া দিল, ভাল। তবে পুরোপুরি অক্ষত কেউই নয়, কমবেশি আহত হয়েছে সবাই। কারও চামড়া ছড়েছে, কেউ কনুই কিংবা হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে।

অন্ধকারে চ্যাকো আর ওরটেগার কথা শোনা গেল। ওরাও ঠিকই আছে বোঝা গেল। কিন্তু জিমের কি অবস্থা?'

ককপিটে গিয়ে ঢুকল তার দুই সহকারী। জিমের নাম ধরে ডাকল চ্যাকো। সাড়া নেই। বিড়বিড় করে কিছু বলে একটা টর্চ খুঁজে বের করে জ্বালল।

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রয়েছে জিম। দ্রুত পরীক্ষা করে দেখল ওরটেগা। না, মরেনি, বেহুঁশ হয়ে গেছে।

'কপাল কেটেছে। বাড়ি খেয়েছে ভালমতই।···এই যে, হুঁশ ফিরছে।'

চোখ মেলল জিম, আপনাআপনি হাত চলে গেল কপালের কাটায়। প্লেন অনড় হয়ে রয়েছে বুঝতে পেরে হাসল, 'পেরেছি তাহলে।'

'হ্যাঁ, পেরেছেন,' পেছন থেকে বলে উঠল কিশোর। ওরাও এসে ঢুকেছে ককপিটে। 'দারুণ দেখিয়েছেন। আগুন ধরছে না কেন এখনও?'

'আর ধরবেও না। ভাগ্য ভাল আমাদের। ধরলে নামার সময় ধাক্কা যখন লেগেছে, তখনই ধরে যেত।'

'প্লেনের বিশ্বাস নেই,' নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জিনা। 'ধরে যেতেও পারে। চলুন বেরিয়ে যাই।'

'না, ধরবে না,' বলল জিম। 'বাইরে যাব কোথায়? যা অন্ধকার, আর জঙ্গল।

কি বিপদ রয়েছে কে জানে। তার চেয়ে এখানেই আপাতত নিরাপদ। ভোরে উঠে বেরোব। তখন দেখব কোথায় পড়েছি, কিভাবে উদ্ধার পাব।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো কিশোর।

খুঁজে ফার্স্ট-এইড কিট বের করল জিনা। জিমের কপালের রক্ত পরিষ্কার করে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল।

সীটগুলোকে মেলে বিছানা বানিয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। ঘুমাতে পারলে ভাবনা অনেকখানি দূর হবে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারবে। তাছাড়া যা ধকল গেছে সারাটা দিন, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর।

কিন্তু নরম গদিতে আরামে শুয়েও সহজে ঘুম আসতে চাইল না। নানারকম ভাবনা ভিড় করে আসছে মনে।

সবার আগে ঘুম ভাঙল মুসার। বাইরে উজ্জ্বল দিন, জানালা দিয়ে আলো আসছে। আশেপাশে চেয়ে দেখল, তার বন্ধুরা সবাই ঘুমিয়ে আছে। তিন হাইজ্যাকারের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেটে পড়ল নাকি?'

রেডিওর কাছ থেকে শোনা গেল ওরটেগার গলা, যন্ত্রটাকে গালমন্দ করছে। খারাপ হয়ে গেছে বোধহয়, চালু করতে পারছে না। 'টু' শব্দও তো করছে না। করি কি এখন?'

এই সময় হাজির হলো জিম আর চ্যাকো। বাইরে বেরিয়েছিল। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, খবর ভাল না।

কিশোর, জিনা আর রবিনেরও ঘুম ভাঙল। ভুরু কুঁচকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জিমের দিকে তাকাল জিনা।

'খালি জঙ্গল,' জানাল জিম। 'তবে এই জঙ্গলই বাঁচিয়ে দিয়েছে আমাদের। কাদামাটি বেশি, জলাভূমিই বলা চলে। কলামবিয়ার বর্ডার থেকে দূরে, ইয়াপুরার কাছে রয়েছি, আমাজন এলাকার মধ্যে। সভ্যতা অনেক দূর। ওরটেগা, রেডিওর খবর কি? কাজ করছে?'

'না, ফিরফাসও করে না। ভাল আটকান আটকেছি। এ-থেকে বেরোতে পারব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'কাছেই একটা ছোট পাহাড় আছে,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল চ্যাকো। 'টিলা বলাই ভাল। ওতে চড়ে দেখা দরকার, কোন দিকে কি আছে। তারপর ঠিক করা যাবে কি করব।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে,' জিম বলল।

'আমরা আসি?' অনুরোধ করল কিশোর। 'হাত-পা সব শক্ত হয়ে গেছে, একটু নাড়াচাড়া দরকার।

হাত নাড়ল জিম। 'ক্ষতি কি? এসো।'

ওরটেগাকে রেডিওর কাছে রেখে বাকি সবাই নেমে এল বিমান থেকে।

চার

দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল ছেলেরা।

এমন জঙ্গল আর কখনও দেখেনি। বড় বড় গাছ, এত উঁচু আর এমনভাবে ডালপালা ছড়িয়েছে, সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না ঠিকমত। পায়েরতলায় ভেজা নরম মাটি, জলাভূমি বলা না গেলেও কাদাভূমি বলা চলে। তার ওপর সবুজ শ্যাওলা। কাদায় পা দেবে যায়। সাবধানে চলতে হচ্ছে। কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে রয়েছে চোরাকাদার মরণফাঁদ।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর মাটি শক্ত হয়ে এল।

যে পাহাড়টার কথা বলেছে চ্যাকো, আসলেই ওটাকে টিলা বলা উচিত। গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে খুব সামান্যই উঠেছে। পাথুরে, খুদে কৃত্রিম পর্বত যেন। রাফিয়ান পাহাড়ে চড়তে পারে না বিশেষ, কিন্তু এটাতে চড়তে তারও অসুবিধে হলো না।

চূড়াটা চোখা নয়, বিশাল ছুরি দিয়ে পোঁচ মেরে কেটে ফেলা হয়েছে যেন, সমান। দাঁড়ানোর চমৎকার জায়গা। নিচে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারল না ওরা। অস্ফুট শব্দ করে ফেলল কেউ কেউ। ঠিক যেন তাদের পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে ইয়াপুর নদী, পুবে। নদীর দুই তীরে চওড়া চরা, হলুদ বালি চিকচিক করছে রোদে। তিন কিলোমিটার মত উঁচু উঁচু পাথরের চাঁইয়ের মাঝে ঢুকে হারিয়ে গেছে নদীটা। তার পরে ছড়িয়ে রয়েছে পাহাড় শ্রেণী, মহান অ্যাণ্ডিজের বিশাল পার্বত্য এলাকা।

অপরূপ সে সৌন্দর্য থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে আনতে হলো। একে অন্যের দিকে তাকাল অভিযাত্রীরা, নীরবে। লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। জীবনের সাড়া নেই। চারপাশে গাছপালার বিস্তারের মাঝে এমন জায়গায় হারিয়েছে ওরা, পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

'বললাম না, ভাল আটকান আটকেছি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল চ্যাকো। 'বেরোনোর পথ নেই। রেডিও খারাপ, এসওএস পাঠাতে পারব না। খাবার-দাবার যা আছে, খুব তাড়াতাড়িই ফুরিয়ে যাবে। তিন-চারজনের আন্দাজ নিয়েছিলাম, তাতেও বেশি দিন চলত না। তার ওপর আরও তিন-চারটে মুখ যোগ হয়েছে।' এমন ভাবে তাকাল সে, কুঁকড়ে গেল ছেলেরা।

কি আছে চ্যাকোর মনে? তাদেরকে এই জঙ্গলে ফেলে চলে যাবে না তো।

ছেলেদের মনের কথা বুঝতে পেরে হাসল জিম, 'ভয় পেয়ো না। তোমাদের ফেলে যাব না। ভাগাভাগি না হয়ে জোট বেঁধে এই বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করব।' পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বলল, 'ধরা যাক, আমরা ভ্রমণকারী, নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছি। হাহ্-হা।'

হাসল বটে জিম, কিন্তু তার চোখের উৎকণ্ঠা দূর হলো না।

নীরবে পাহাড় বেয়ে নেমে আবার ফিরে চলল ওরা।

বাতাসে আর্দ্রতা এত বেশি, অসহ্য মনে হচ্ছে গরম। চটচটে ঘাম, যেন আঠা মাখিয়ে দেয়া হয়েছে শরীরে। অস্বস্তিকর। ঘন ঝোপঝাড়ের দিকে তাকালে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকারে ঘাপটি মেরে আছে হিংস্র সব নাম-না-জানা জানোয়ার, যে কোন মুহূর্তে এসে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

বিমানে ফিরে দেখল হতাশ হয়ে বসে আছে ওরটেগা।

'নাহ্, হলো না,' দেখামাত্র বলল সে। 'অনেক সময় লাগবে মেরামত করতে, আদৌ যদি মেরামত হয়। কয়েক দিন এমন কি কয়েক হপ্তাও লাগতে পারে। ততদিনে না খেয়েই মরে যাব।'

'এত ভেঙে পড়লে চলবে না,' জিম বলল। 'প্ল্যান করে এগোতে হবে। এখনই বাঁচার আশা ছেড়ে দিলে মরবই তো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, হাল ছাড়ব না কিছুতেই।' উপযুক্ত লোক জিম, নেতা হওয়ার গুণ তার আছে।

'প্লেনটা আমাদের হেডকোয়ার্টার,' বলল সে। 'এখান থেকেই আশপাশে অভিযান চালাব, পথ খুঁজে বের করব।'

'খাবারের কি হবে?' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'হ্যাঁ, ঠিক,' কিশোরও বলল, 'খাবার?'

'কিছু খাবার তো আছে। ওগুলো থাকতে থাকতে রেডিও ঠিক হয়ে গেলে, বেঁচে যাব।'

এরপর কাজে লাগল জিম। সব খাবার বের করে নিজের দায়িত্বে নিল। হিসেব করে খেতে হবে।

'ফুরিয়ে গেলে কি করব?' প্রশ্ন করল চ্যাকো।

'পানির ভাবনা নেই,' বলল জিম। 'নদীর পানি এনে ভালমত ফুটিয়ে খেলেই অসুখের ভয় থাকবে না। তবে হ্যাঁ, শিকার একটা বড় সমস্যা।'

কয়েকটা পিস্তল আর একটা সাব-মেশিনগান ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই হাইজ্যাকারদের কাছে। ফাঁদ পাততে জানে না। বলতে গেলে, জঙ্গলে টিকে থাকার কোন অভিজ্ঞতাই তাদের নেই।

আলাপে কান না দিয়ে নতুন রেডিও মেরামতে মন দিল ওরটেগা। বুঝতে পারছে, তাদের সবার জীবন এখন ওই যন্ত্রটার ওপর নির্ভর করছে, যে ভাবেই হোক সারাতে ওটাকে হবেই। কিন্তু এমন ভাঙা ভেঙেছে, সারানোও খুব কঠিন। কিছু স্পেয়ার পার্টস আছে প্লেনের যন্ত্রপাতির ইমারজেন্সি বক্সে। আর কিছু বদলাতে পারবে অন্যান্য যন্ত্রপাতি থেকে খুলে এনে। কিন্তু তারপরেও ঠিক হবে তো? তেমন ভাল টেকনিশিয়ান নয় ওরটেগা।

কাজ মোটামুটি ভাগ করে নিয়েছে ওরা। চ্যাকো রান্না করে, তাকে সাহায্য করে রবিন আর জিনা। জিমের সঙ্গে শিকারে যায় মুসা, পাওয়া যায় না প্রায় কিছুই,

তবু রোজ বেরোয়। ওরটেগা রেডিও নিয়ে থাকে, তাকে সহায়তা করে কিশোর। রাফিয়ানও অকেজো থাকে না। শিকারে যায়, রাতে পাহারা দেয়। তার খাবারটা সে অর্জন করেই নেয়।

হাইজ্যাকার আর জিম্মিদের মাঝের ফারাকটা আর নেই, বন্ধু হয়ে গেছে ওরা।

কয়েক দিন চলে গেল, কিন্তু রেডিও ঠিক হলো না। হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ওরটেগা, 'আমার ক্ষমতায় কুলাবে না।'

'খাবারও ফুরিয়ে এসেছে,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল চ্যাকো। 'জিম, কিছু একটা করো। আর তো দেরি করা যায় না।'

কিছু একটা করা দরকার, তাড়াতাড়ি, সবাই একমত হলো এতে। কিন্তু কি করবে। রেডিও অচল, হাইজ্যাকাররা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। বাইরে থেকে সাহায্য আসার কোন আশা নেই। একটাই পথ আছে, বেরিয়ে পড়া। তারপর ভাগ্য ভাল হলে বাঁচবে, নইলে মৃত্যু। বিকল্প আর কিছু নেই।

খাবার যা অবশিষ্ট আছে গুছিয়ে নেয়া হলো। ফার্স্ট-এইড কিট, কয়েকটা কম্বল, রান্নার সরঞ্জাম আর আরও দুয়েকটা টুকিটাকি জিনিস বেঁধে ভাগাভাগি করে কাঁধে তুলে নিল ওরা, বেরিয়ে পড়ল নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

কয়েক দিন প্লেনটাই ছিল তাদের ঘর, এখন ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে। বার বার পেছনে ফিরে তাকাল ওরা। আর যাই হোক, নিরাপদ আশ্রয় তো অন্তত ছিল।

ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা, সাতজন মানুষ আর একটা কুকুর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল ইয়াপুরার তীরে।

কিশোর পরামর্শ দিল, 'নদী ধরেই এগোনো যাক। খাবার আর গোসলের পানি পাব। সবচে বড় কথা, পথ হারানোর ভয় থাকবে না। নদীর ধারে মানুষের বসতি থাকার সম্ভাবনাও বেশি।'

সবাই রাজি হলো। নদীর ধার ধরেই এগোল ওরা।

খোলা চরা, গাছপালার ছায়া নেই। কড়া রোদ। ভীষণ গরম। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ল সকলে। ঝামেলা বাড়াল রবিন। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে পায়ে ব্যথা পেল। ওই পা-টা অনেক দিন আগে একবার ভেঙেছিল পাহাড়ে চড়ার সময়, আবার চোট লাগল ওটাতেই। খোঁড়াতে শুরু করল সে।

জোর করে রবিনের বোঝা ভাগ করে নিল মুসা আর কিশোর।

দাঁতে দাঁত চেপে চলেছে জিনা। ঘোড়ায় চড়া আর ব্যায়ামের অভ্যাস আছে বলে হাঁটতে পারছে এখনও। মুসা কষ্ট সহ্য করতে পারে, কাজেই কিশোর কিংবা জিনার মত হাঁপিয়ে ওঠেনি সে।

বেচারা রবিনের অবস্থা করুণ। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে, পায়ের গোড়ালি ফুলে গেছে, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার। তবু টুঁ শব্দ করছে না, এগিয়ে চলেছে সবার সাথে, কিন্তু খুব মন্থর।

'ইসৃসি, দেরি করিয়ে দেবে দেখছি,' বলল চ্যাকা।

রবিনের দিকে ফিরে হাসল জিম। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যতক্ষণ পারো, হাঁটো। না পারলে বয়ে নিয়ে যাব। ভয় নেই।'

রোদ যতই চড়ছে, গরমও বাড়ছে সেই অনুপাতে। দুপুরের দিকে তো মনে হলো, সেদ্ধ হয়ে যাবে একেকজন। থামল। কাপড় খুলে ঝপাং করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা।

একে একে সবাই নামল।

অনেকক্ষণ ধরে গোসল করল ওরা। তারপর গাছের ছায়ায় খেতে বসল। ভ্যাপসা গরম না থাকলে, আর পর্যাপ্ত খাবার থাকলে পিকনিক ভালই জমত।

বিকেলের দিকে যেন সহ্যশক্তির পরীক্ষা শুরু হলো। বিরূপ প্রকৃতি যেন দেখতে চায়, তার দাপট কতখানি সইতে পারে অভিযাত্রীরা। রাফিয়ানের পর্যন্ত জিভ বেরিয়ে গেল।

রবিনের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। ডাল কেটে, তাতে কম্বল বেঁধে স্ট্রেচার বানিয়ে বয়ে নেয়া হচ্ছে তাকে। খুব লজ্জা পাচ্ছে রবিন, নিজেকে দোষারোপ করছে। আছাড় খেয়ে পা ভাঙার জন্যে নিজেকেই দায়ী করছে।

পায়ের মাংসপেশীতে খিঁচ ধরে গেছে জিনা আর কিশোরের। আধমন ভারি মনে হচ্ছে একেকটা পা।

সামান্যতম প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। এ-এক অদ্ভুত জঙ্গল। ভয় ভয় লাগে। নীরবতা যেন ভারি হয়ে ঠাঁই নিয়েছে এখানে। কথা বলতে অস্বস্তি লাগে।

হঠাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাত। সাঁঝ প্রায় হলোই না, এই দেখা গেল শেষ বিকেল, পরক্ষণেই ঝপাত করে রাত্রি।

'থামো,' বলল জিম। 'এখানেই রাত কাটাব।'

দিনটা যেমন গরম গেছে, রাতটা তেমনি ঠাণ্ডা হবে, গত কদিনে বুঝে গেছে ওরা। শুকনো ডালপাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালল জিম। কয়েকটা কাঁচা ডাল কেটে তাতেও আগুন ধরাল। জ্বলবে ধীরে, ধোঁয়া হবে বেশি। মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা। কিন্তু এই ধোঁয়ায় কি আর মশা যায়? ভারি চাদরের মত ঝাঁক বেঁধে এসে অভিযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে রাতের খাওয়া সারল ওরা। সবাই বিষণ্ণ। মন হালকা করার জন্যে রসিকতা করল কিশোর, 'আমি যখন দাদা হব, তিন কুড়ি নাতিপুতি হবে, তাদেরকে এই অভিযানের গপ্পো শোনাব। চোখ এত্তো বড় বড় করে শুনবে ওরা। বিশ্বাস করতে পারবে না। বাবা-মাকে গিয়ে সেকথা জিজ্ঞেস করবে, সত্যি কিনা। ওরা ধমক দিয়ে বলবে, বাজে বকিস না। বুড়োহাবড়াটার সঙ্গে থেকে থেকে ছেলেগুলোর মাথাও গেল। খালি মিছে কথা। হি-হি।'

কেউ হাসল না।

মুসা বলল, 'ইস্, কি আমার গল্পরে! তা-ও যদি ইনডিয়ানরা আক্রমণ করে ধরে নিয়ে যেত, শেষে অনেক কষ্টে পালাতাম, নাহয় এককথা ছিল। প্লেন থেকে নেমে

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, রাতে মশার কামড় খাওয়া, হলো নাকি কিছু এটা? যা জঙ্গল, বাঘ তো দূরের কথা, একটা শেয়ালও নেই।'

'এত বড় বড় কথা বোলো না,' অন্য ধার থেকে হুঁশিয়ার করল চ্যাকো। 'ইনডিয়ান নেই কে বলল তোমাকে? সিনেমায় যেমন দেখো, তেমনটি হয়তো নেই। কিন্তু যারা আছে, তারাও কম হারামী না।'

'আছে নাকি এদিকে?' চিত হয়ে ছিল, কনুয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো রবিন।

'আছে। জিভারো ইনডিয়ানদের এলাকা এটা।'

'জিভারো?' জিনা মুখ তুলল।

'হ্যাঁ, জিভারো। অনেক ইনডিয়ানদের মত ওরাও নরমুণ্ডের ট্রফি রাখে। যদি টের পায় আমরা আছি, চোখের পলকে এসে হাজির হবে। কিছু বোঝার আগেই দেখব আমাদের ঘিরে ফেলেছে।'

'থাক থাক, আর বলবেন না,' হাত নাড়ল মুসা। 'পরক্ষণেই হয়তো দেখব বর্শার মাথায় আমাদের কাটা মুণ্ডগুলো শোভা পাচ্ছে!' ভয়ে ভয়ে জঙ্গলের দিকে তাকাল সে। 'আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

হঠাৎ *টক্‌কো, টক্‌কো* করে বিচিত্র একটা শব্দ হলো। ঝট করে জঙ্গলের দিকে তাকাল ছেলেরা। কিসের শব্দ?

'সর্বনাশ, জিভারো!' ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন চ্যাকো, এমনি ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল, 'জঙ্গলের মধ্যে একজন আরেকজনকে সঙ্কেত দিয়ে জানাচ্ছে, শিকার পাওয়া গেছে।'

আবার শোনা গেল টক্‌কো টক্‌কো। আরও কাছে।

'আহ্, তোমরা কি শুরু করলে?' মৃদু ধমক দিল জিম। 'খামোকা ভয় দেখাচ্ছ ছেলেগুলোকে!'

'খামোকা ভয়?' জিমের কথা বুঝতে পারল না মুসা।

'জিভারো না ঘোড়ার ডিম, ওরটেগার শয়তানী...' কথাটা শেষ করল না জিম। 'এই, কম্বল খোলো। শোয়া দরকার।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!' মুসার মত জিনাও অবাক। 'শব্দ তো একটা হয়েছে। সবাই শুনেছি আমরা। শয়তানীটা কিসের?'

'ভেনট্রিলোকুইজম!' বুঝে ফেলেছে কিশোর। 'ওরটেগা এই বিদ্যে জানে। আমাদের ভয় দেখানোর জন্যে সে-ই করেছে ওই শব্দ।'

ও, এই ব্যাপার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মুসা। বুকে ফুঁ দিতে দিতে বলল, 'ইস্, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলেন!'

কম্বলের বাণ্ডিল খুলছে ওরটেগা। শব্দ করে হাসল।

চ্যাকোও হাসল।

কম্বল খোলা শেষ হলে ওরটেগা ডাকল, 'এসো, শুয়ে পড়া যাক।'

'এক মিনিট,' বাধা দিয়ে বলল জিম। 'একজনকে পাহারায় থাকতে হবে। পালা

করে পাহারা দেব। ওরটেগা, শুরুতে তুমি থাকো। মাঝরাতের দিকে আমাকে তুলে দিয়ো। শেষরাতে আমি চ্যাকোকে তুলে দেব।'

'আমি আর মুসাও পাহারা দিতে পারব,' কিশোর প্রস্তাব রাখল।

'না না, দরকার নেই। তোমরা ঘুমাও। প্রয়োজন হলে বলব।'

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে ছেলেরা। জিনার গা ঘেঁষে আছে রাফিয়ান। চোখ বোজা, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই জেগে যাবে।

কিন্তু এতবড় একটা জঙ্গলেও জাগিয়ে দেয়ার মত কোন শব্দ ঢুকল না রাফিয়ানের কানে। খালি মশার বিরক্তিকর একঘেয়ে গান, আর আগুনে কাঠ পোড়ার মৃদু চড়চড় ছাড়া আর কোন আওয়াজই নেই। ও হ্যাঁ, আছে, নিঃশ্বাসের শব্দ। আর মশার ঘ্যানর ঘ্যানরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে চ্যাকো।

কমে আসছে দেখে আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলল ওরটেগা। পাহারা দেবে কি? সারাদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে তার চোখও ঢুলুঢুলু, টেনে চোখের পাতা খোলা রাখতে পারছে না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল, টেরও পেল না।

ঘুম ভেঙে গেল মুসার। মাথা তুলে রাফিয়ানের দিকে চেয়ে দেখল, সে-ও সতর্ক হয়ে উঠেছে। চোখ মেলা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জঙ্গলের দিকে।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জঙ্গলের দিকে তাকাল মুসা। কিছুই দেখল না। শব্দ একটা হয়েছে, সে নিশ্চিত। নাহলে ঘুম ভাঙল কেন?

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হলো না। চারপাশে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল জঙ্গল। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এল একদল মানুষ। সে-কি বিকট চিৎকার ওদের। হাতে বল্লম। কয়েকজনের কাছে পুরানো আমলের বন্দুক। ঘিরে ফেলল অভিযাত্রীদের।

'জিভারো!' ফিসফিসিয়ে বলল আতঙ্কিত চ্যাকো। এবার আর রসিকতা নয়।

কিছুই করতে পারল না অভিযাত্রীরা। দেখতে দেখতে বুনো লতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হলো ওদের। দুই হাত দুই পাশে রেখে বুক আর পিঠের ওপর দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধেছে, হাত নড়ানোরও উপায় রইল না।

পাঁচ

ভয়ে দুরুদুরু করছে সবার বুক। কিন্তু রাফিয়ানের কথা আলাদা। সে ভয় পেল না। বন্ধুদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে ভীষণ রেগে গেল। লাফিয়ে পড়তে গেল একজন ইনডিয়ানের ওপর।

'না, রাফি, না!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'রাফি, খবরদার, মেরে ফেলবে!' চোখের সামনে তার প্রিয় কুকুরটাকে খুন হতে দেখতে পারবে না সে।

কি বুঝল রাফিয়ান কে জানে, আর আক্রমণের চেষ্টা করল না।

বন্দিদের দিকে চেয়ে খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ইনডিয়ানদের। বিজাতীয়

ভাষায় কথা বলছে, তার এক বর্ণও বুঝল না অভিযাত্রীরা।

জংলীদের সারা গা খালি, কোমরের কাছে কিছু পাতা বেশ কায়দা করে জড়িয়েছে, সুন্দর ঝালরের মত ঘিরে রেখেছে সেই বিচিত্র পোশাক। ঝালর বানানোর আগে পাতাগুলোকে লাল আর হলুদ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছে। একই ধরনের ছোট ঝালর জড়িয়েছে গোড়ালি আর বাজুতে। একজনের মাথায় লতার বন্ধনীতে পাখির দুটো পালক গোঁজা। বোঝা যাচ্ছে, সে দলটার নেতা। লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জিম, 'কি চাও?'

ইংরেজি বোঝার কথা নয় জংলীটার, কিন্তু বোধহয় অনুমান করে নিয়েই জঙ্গলের দিকে হাত তুলে তার ভাষায় বলল কিছু। তারপর ইশারায় হাঁটার নির্দেশ দিল বন্দিদের।

ইনডিয়ানদের হাতের জ্বলন্ত মশালের আলোয় বুনোপথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জিনা। 'ওদের রাজার কাছে?'

'তাছাড়া আর কোথায়?' তিক্ত হাসি হাসল ওরটেগা। নিজের ওপর মহা-খাপ্পা। 'শালার ঘুম আর রাখতে পারলাম না। তা না হলে···'

'তা না হলেও কিছু করতে পারতেন না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'এটা বরং ভালই হলো। জেগে থাকলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতেন, আরও খারাপ হত তাহলে।'

ঠিকই, কিশোরের কথা মেনে নিল ওরটেগা, দলে অনেক ভারি ইনডিয়ানরা।

ঘন বনের ভেতর দিয়ে সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। বিশ্রাম নেয়ায় রবিনের পায়ের ফোলা অনেক কমেছে, কিন্তু সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আবার ব্যথা শুরু হয়েছে। তার মনে হলো, শ-খানেক বছর একটানা চলে লক্ষ লক্ষ মাইল বুনোপথ পেরোনোর পর একটা খোলা জায়গায় বেরোল। ছোট ছোট অসংখ্য কুঁড়ে, গাছের ডালপাতা দিয়ে তৈরি। জিভারো ইনডিয়ানদের গ্রাম।

মাঝখানের কুঁড়েটা আশপাশেরগুলোর চেয়ে বড়। বন্দিদেরকে ওটার দিকে নিয়ে চলল জংলীরা।

বিশাল এক ইনডিয়ান বেরিয়ে এল বড় কুঁড়েটার দরজায়, গায়েগতরে যেন একটা দৈত্য। মাথায় টিউকান পাখির পালক গোঁজা। বোঝা গেল, সে-ই রাজা কিংবা সর্দার।

তার দিকে বন্দিদের ঠেলে দিল জংলীরা।

লোকটার বয়েস যে কত হয়েছে কে জানে, একশো থেকে দেড়শোর মাঝে যা খুশি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের দেখে অবাক হয়েছে সে। তাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ, তারপর আদেশ দিল কিছু। গমগমে ভারি কণ্ঠ, মেঘ ডাকল যেন।

দু-দলে ভাগ করে ফেলা হলো বন্দিদের। হাইজ্যাকাররা একদিকে, ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে। দু-দিক থেকে প্রত্যেকেরই হাত চেপে ধরল দুজন করে ইনডিয়ান। বন্দিরা ভাবল, তাদের শেষ সময় উপস্থিত। ভয়ে আতঙ্কে কাঁপছে সবার বুক।

কিন্তু মারল না তাদেরকে ইনডিয়ানরা। টেনে নিয়ে চলল। একটা খালি কুঁড়েতে ছেলেদের ঠেলে দেয়া হলো, হাইজ্যাকারদেরকে আরেকটা কুঁড়েতে। তারপর বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল জংলীরা।

তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গেই রয়েছে রাফিয়ান।

গোটা দুই ছোট মশাল জ্বলছে কুঁড়েতে। আঁধার কাটছে না। সেই ম্লান আলোয় পরস্পরের দিকে তাকাল চারজনে।

'ভাল বিপদে পড়েছি,' মুখ খুলল মুসা। 'বেরিয়েছিলাম বেড়াতে···আহ্, কি একখান বেড়ান বেড়াচ্ছি। স্বপ্নেও ভাবিনি কখনও এরকম হবে, তাহলে কি আর বেরোই? প্লেন হাইজ্যাক, জঙ্গলের মাঝে ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং তারপর এসে পড়লাম নরমুণ্ড শিকারীদের কবলে।

'তো-তুমি কি সত্যি মনে করো···' কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের, 'ওরা আমাদের মাথা কেটে ট্রফি বানাবে?' পায়ের গোড়ালিতে হাত বোলাল সে।

'তোমার কি মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'বইয়ে তো পড়েছি অন্যরকম,' এক মুহূর্ত চুপ রইল রবিন। 'কিন্তু বইয়ের সঙ্গে বাস্তবের মিল কতখানি আছে কে জানে। আজকাল নাকি নরমুণ্ড শিকারী আর নেই। জিভারোরা মানুষের মাথার ট্রফি এখনও রাখে শুনেছি—কিন্তু অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীদের ধারণা, সেগুলো জ্যান্ত মানুষের মাথা কেটে নয়, যারা মরে যায়, তাদের।'

'আমিও শুনেছি,' কিশোর বলল। 'মরা মানুষেরই হোক আর জ্যান্ত মানুষেরই হোক, ব্যাটারা ট্রফি বানায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মিউজিয়মে ওরকম একটা ট্রফি দেখেছি, অনেক পুরানো মানুষের। মাথার আসল আকার নেই, ছোট করে ফেলেছে, একটা টেনিস বলের সমান।'

'মারছে রে! দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'খুব খারাপ। গা গুলিয়ে ওঠে।'

'অত ছোট করে কি করে?' জিনা জানতে চাইল।

'হাড়-মগজ-মাংস সব বের করে ফেলে। চুল ঠিকই রাখে। তারপর চামড়া শুকাতে শুকাতে এমন অবস্থায় নিয়ে আসে···'

'থাক থাক, আর বলার দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে,' বাধা দিল মুসা। 'আমাদের পালানো উচিত, যত জলদি পারা যায়। জংলীদের বিশ্বাস নেই। মরা মানুষের মাথা কাটে বলেছে তো? আমিও বিশ্বাস করি। কাজটা খুবই সহজ। জ্যান্ত মানুষকে মেরে ফেললেই মরে যায়, তখন আর মাথা কেটে নিতে অসুবিধে কোথায়।

বই লেখে যারা, ওসব ধড়িবাজ শিকারী আর ভ্রমণকারীদের কথা ছাড়ো।'

'কিন্তু পালাই কিভাবে?' নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর। 'পালিয়ে যাবই বা কোথায়? বড়জোর গিয়ে প্লেনটায় উঠতে পারব। জিম আর তার সঙ্গীদেরও বের করে নিয়ে যেতে হবে। ওদেরকে ছাড়া মাইলখানেকও টিকব না এই জঙ্গলে। ধরো, এত কিছু করে পালাতে পারলাম। কিন্তু তারপর কি হবে? আমাদের পিছু নিয়ে ঠিক প্লেনের কাছে হাজির হয়ে যাবে ইনডিয়ানরা, আবার ধরে আনবে।'

'কিন্তু তাই বলে চুপ করে থাকলে তো হবে না। কিছু একটা করা দরকার।'

'দেখো আগে এ-ঘর থেকেই বেরোতে পারো কিনা,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'তারপর তো অন্য কথা।'

দেয়ালের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখল জিনা আর মুসা। কিশোর আর রবিন বসে রইল, অযথা কষ্ট করতে গেল না। ইনডিয়ানদের এসব কুঁড়ে সম্পর্কে প্রায় সবই জানা আছে ওদের, বইয়ে পড়েছে। শক্ত সোজা গাছ কেটে গায়ে গায়ে লাগিয়ে গভীর করে মাটিতে পোঁতা হয়। ওগুলোকে মজবুত করে বাঁধা হয় পাকা বেত দিয়ে। বোমা মারলেও ওই গাছের বেড়ার কিছু হবে কিনা সন্দেহ, আর ছেলেদের সঙ্গে তো রয়েছে শুধু সাধারণ ছুরি। বেতই কাটতে পারবে না, থাক তো গাছ কাটা।

মাটির মেঝে, কিন্তু নিয়মিত লেপে লেপে সিমেন্টের মত শক্ত করে ফেলা হয়েছে। সুড়ঙ্গ কেটে যে নিচ দিয়ে বেরোবে, তারও উপায় নেই।

বেড়া দেখা শেষ। বাকি রইল দরজা।

কিন্তু দরজায় ঠেলা দিয়েই অবাক হয়ে গেল জিনা। খোলা। শুধু ভেজিয়ে রেখে গেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না তার। আস্তে করে ঠেলে ফাঁক করল খানিকটা। উঁকি দিয়ে দেখল, অনেক কুঁড়ের সামনে আগুন জ্বলছে। লালচে আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো এলাকাটা।

খুব সাবধানে, নিঃশব্দে দরজা আরেকটু ফাঁক করল জিনা। বাকি তিনজনও এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, না না, চারজন, রাফিয়ানও।

এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে বাইরে পা রাখল মুসা।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ছায়া থেকে উদয় হলো একটা মূর্তি। একজন জিভারো যোদ্ধা। আগুনের আলোয় লোকটার মুখ দেখা যাচ্ছে, তাতে ভয়াল কিছু নেই। শান্ত।

আবার পিছিয়ে এসে কুঁড়েতে ঢুকল মুসা। কেন দরজা বন্ধ করেনি ইনডিয়ানরা, বোঝা গেল।

দরজাটা ফাঁকই রইল। ছেলেরাও বন্ধ করল না, পাহারাদারও না।

'বুঝলে তো?' কিশোর বলল। 'পালাতে পারব না।'

বন্ধ কুঁড়েতে রাফিয়ানের আর ভাল লাগল না। দরজা খোলা পেয়ে লেজ

নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসার জন্যে। ফিরেও তাকাল না পাহারাদার। তার ওপর নির্দেশ রয়েছে ছেলেদের দেখে রাখার জন্যে, কুকুর থাকল না গেল, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

একটা মতলব এল কিশোরের মাথায়।

'শোনো,' নিচু স্বরে বলল সে। 'রাফিকে দিয়ে জিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি আমরা।'

'কি ভাবে?' প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করল অন্য তিনজন।

'সহজ। একটা নোট লিখে রাফির গলায় বেঁধে দেব। বললেই দিয়ে আসবে সে।'

'কি লিখব, আমরা পালানোর ঝুঁকি নিতে চাই? আমার বিশ্বাস, ওদের দরজাও আটকানো নেই। কি নীরব দেখছ না? ইনডিয়ানরা সব ঘুমাচ্ছে, মাত্র দুজন পাহারাদার ছাড়া সবাই। একজন আমাদের কুঁড়ে পাহারা দিচ্ছে, আরেকজন ওদের। একই সঙ্গে দুজনকে ধরে যদি কাবু করে ফেলতে পারি, তাহলেই হলো।'

'খুব রিস্কি মনে হচ্ছে,' রবিন বলল।

'যে অবস্থায় পড়েছি, রিস্ক তো নিতেই হবে।' পাহারাদারকে কাবু করার কথা বলল বটে কিশোর, কিন্তু কিভাবে করবে সেটা এখনও জানে না। আক্রান্ত হলে নিশ্চয় চেঁচামেচি করবে সে, সারা গ্রাম জাগিয়ে ছাড়বে। তখন?

সেটা পরে দেখা যাবে, ভেবে পকেট থেকে নোটবই বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল কিশোর। লিখে, কাগজটা ভাঁজ করে জিনার হাতে দিল।

আস্তে শিস দিয়ে রাফিয়ানকে ডাকল জিনা। কুকুরটা ফিরে এলে তার কলারে শক্ত করে কাগজটা আটকে দিল। 'রাফি, এটা জিমকে দিয়ে আয়।'

একবারেই বুঝল বুদ্ধিমান কুকুরটা। বেরিয়ে গেল। ফিরে এল খানিক পরে। কলারে আটকানো আরেকটা কাগজ।

খুলে জোরে জোরে পড়ল কিশোর :

'হুট করে কিছু কোরো না। যেখানে রয়েছ, থাকো। আমরা পালানোর উপায় খুঁজছি। আধঘণ্টা পর রাফিকে পাঠাবে।'

অপেক্ষার পালা।

আধ ঘণ্টাই অনেক বেশি মনে হলো। রাত বেশি বাকি নেই। অন্ধকার থাকতে থাকতে না পারলে পরে কঠিন হয়ে যাবে পালানো।

অবশেষে রাফিয়ানকে আবার পাঠানোর সময় হলো।

আরেকটা নোট নিয়ে ফিরে এল রায়ান। খুলে পড়ে বোকা হয়ে গেল ছেলেরা। জিম লিখেছে:

আমরা তিনজন যাচ্ছি। তোমাদের নিতে পারছি না, কারণ, তাতে আমাদের চলা ধীর হয়ে যাবে। নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব। পারলে, যত তাড়াতাড়ি পারি সাহায্য

নিয়ে ফিরে আসব তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্যে। চিন্তা কোরো না। সাহস হারিয়ো না।'

'ইয়াল্লা!' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুসা। 'আর কোন উপায় নেই। জংলীদের ট্রফির জন্যে মাথাটা বুঝি খোয়াতেই হলো!'

অন্য সময় হেসে ফেলত ওরা, কিন্তু এখন ভাবনা বড় বেশি।

পালানোর আশা শেষ। চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? এই অবস্থায় ঘুম আসার প্রশ্নই ওঠে না। বেড়ায় হেলান দিয়ে কান পেতে রইল ওরা, হাইজ্যাকারদের পালানোর শব্দ শোনার জন্যে।

সময় যাচ্ছে। নীরবতায় কোন রকম ছেদ পড়ল না। তাহলে কি পালানোর চেষ্টা করছে না ওরা? নাকি ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে, নিঃশব্দে?

পুব আকাশে আলোর আভাস দেখা গেল। ফিকে হতে শুরু হলো অন্ধকার, ভোর হয়ে আসছে। জিভারোদের কুঁড়ের সামনে আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে, সেগুলোতে কাঠ ফেলে আবার বাড়িয়ে দেয়া হলো। কেউ কেউ আর ঘরে ঢুকল না, হাঁটাহাঁটি করতে লাগল, ভোরের তাজা হাওয়া গায়ে মাখছে।

আলো বাড়ল।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে পাল্লা পুরো খুলে গেল। কুঁড়েতে ঢুকল একটা মেয়েলোক। হাতে বেতের ঝুড়িতে ফল। নীরবে ঝুড়িটা ছেলেদের সামনে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'এসো, নাস্তা,' ডাকল কিশোর। 'ইস্, এক প্লেট ডিম ভাজা আর রুটি যদি পেতাম।'

'যা পাওয়া গেছে তাই বা মন্দ কি?' দুহাতে দুটো ফল তুলে নিল মুসা, কটাস করে এক কামড়ে অর্ধেকটা মুখে নিয়ে চিবাতে শুরু করল। 'আঁউম, বেশ মিষ্টি,' মুখ খাবারে বোঝাই থাকায় শোনাল 'বেশ্মিট্টি'।

হঠাৎ শোনা গেল চেঁচামেচি। মেয়ে কণ্ঠ। কথা বোঝা গেল না অবশ্যই।

দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল ছেলেরা, কয়েকজন যোদ্ধা ছুটে যাচ্ছে খানিক দূরের আরেকটা কুঁড়ের দিকে। ওটাতেই রাখা হয়েছিল হাইজ্যাকারদের। শোরগোল বাড়ল। দেখতে দেখতে পুরো গ্রাম এসে ভিড় জমাল কুঁড়ের সামনে।

'পালিয়েছে তাহলে!' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার চেহারা। 'দেখেছ কেমন রেগে গেছে? সব ঝাল না এসে আমাদের ওপর ঝাড়ে এখন ব্যাটারা।'

ছয়

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছে ছেলেরা, ইনডিয়ানরা কি করে।

একদল জিভারো যোদ্ধা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। কেন গেছে, সেটা আর বলে দিতে হলো না ছেলেদের, বুঝল পলাতকদের কি

ধরতে পারবে?

জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেল যোদ্ধাদের শোরগোল। গাঁয়ের লোকেরা দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হলো। কেউ এল না ছেলেদের ঘরের দিকে। আস্তে আস্তে অস্বস্তি দূর হলো ওদের।

মেয়েলোকটা নিশ্চয় বলেছে যে, ছেলেরা কুঁড়েতে রয়েছে। যুক্তি মানে, এমন কেউ ভাববে না, তিনজন লোকের পালানোর ব্যাপারে ছেলেদের কোন যোগসাজশ রয়েছে। কিন্তু কথা হলো, যুক্তি কতখানি মানে কিংবা বোঝে জিভারোরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'আল্লাই জানে কি হবে।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গতরাতে যে পাহারায় ছিল, সেই লোকটা এল। চেহারা দেখে ভালমন্দ কিছু বোঝা গেল না। ইশারায় বাইরে বেরোতে বলল তাদেরকে।

কুঁড়ে থেকে বেরোল ছেলেরা। লোকটার পিছু পিছু সর্দারের কুঁড়ের দিকে এগোল।

কিন্তু সর্দারের কুঁড়েতে না গিয়ে কাছের আরেকটা বড় কুঁড়েতে তাদেরকে নিয়ে এল লোকটা। কুঁড়ের কাছ থেকে বড় জোর দশ কদম দূরে রয়েছে ওরা, এই সময় দরজায় দেখা দিল অদ্ভুত দর্শন এক মূর্তি।

আর দশজন সাধারণ জিভারোর চেয়ে লম্বা, বিকট মুখোশে মুখ ঢাকা। মাথার বন্ধনীতে লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। জানোয়ারের চামড়ায় তৈরি বিচিত্র পোশাক পরনে। পালক আর পশুর দাঁতের তৈরি লম্বা মালা কয়েক প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে গলায়।

রবিন জানে, বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে ওই ধরনের পোশাক, মুখোশ আর মালা পরে জংলী ওঝারা। তাহলে এখন কি কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হবে? কি সেটা? ইনডিয়ানদের নিষ্ঠুর কোন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে বন্দিদের?

অনেকক্ষণ নীরবে একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইল ওঝা। তারপর এগিয়ে এসে আস্তে করে হাত রাখল কিশোরের মাথায়। তার ব্যবহারে ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই। একে একে, মুসা, রবিন আর জিনার মাথায়ও একইভাবে হাত রাখল সে।

আর দাঁড়াল না পাহারাদার, বোধহয় থাকার প্রয়োজন মনে করল না। ঘুরে চলে গেল।

ওঝার সঙ্গে বন্দিরা একা। অনুমান করতে কষ্ট হলো না, ওই অদ্ভুত লোকটা তাদেরকে তার ছত্রছায়ায় নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাতে এখুনি খুশি হওয়ার কিছু নেই। কেন নিয়েছে কে জানে?

কুঁড়ের সামনের আঙিনায় লোকের ভিড়, মেয়ে-পুরুষ-বাচ্চারা সবাই চেয়ে রয়েছে এদিকে। ইশারায় গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে দিল ওঝা, বন্দিদেরকে তার দায়িত্বে নিয়েছে।

তিক্ত কণ্ঠে রসিকতা করল মুসা, 'মাকড়সা বলছে মাছিকে : আমার বাড়ি এলো বন্ধু বলতে দেব···' বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, বোঝা গেল না। তারপর ওঝার দিকে চেয়ে বলল, 'গলায় যা একেকখান দাঁত ঝুলিয়েছ না, জংলীদাদা। মানুষের গোশত খাওয়ার সময় ওগুলো লাগিয়ে নাও নাকি?'

'আহ্, চুপ করো!' বিরক্ত হয়ে ধমক দিল কিশোর। 'বিপদ আরও বাড়াবে দেখছি!'

ছেলেদেরকে তার কুঁড়েতে নিয়ে এল ওঝা। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে নানা আকৃতির অসংখ্য মুখোশ, একেকটার মুখভঙ্গী একেক রকম। আরও নানারকম অদ্ভুত জিনিস রয়েছে, তার মাঝে নরমুণ্ড শিকারী ইনডিয়ানদের তৈরি মানুষের মাথার সঙ্কুচিত ট্রফিও আছে।

'এই গল্প নিয়ে দারুণ একখান অ্যাডভেঞ্চার ফিল্ম করতে পারবেন মিস্টার ক্রিস্টোফার,' মুসা বলল।

'তা পারবেন,' মাথা দোলাল জিনা। 'কিন্তু আগে আমাদের বেঁচে ফিরে তো যেতে হবে?'

অপার্থিব লাগছে ঘরের পরিবেশ। ওঝাকেও কেমন যেন মেকি মনে হচ্ছে কিশোরের কাছে। কেন, বলতে পারবে না। পুরো ব্যাপারটাই যেন সাজানো, অভিনয়।

ঘরে দুজন ইনডিয়ান মেয়ে আছে। কর্কশ কণ্ঠে তাদের কিছু বলল ওঝা।

হাত ধরে নিয়ে ছেলেদের বসাল ওরা। প্রত্যেকের গালে লাল আর হলুদ রঙের আলপনা এঁকে দিল। চামড়ার তৈরি খাটো আলখেল্লা পরতে দিল, সেগুলোতেও লাল-হলুদ আঁকিবুঁকি। রাফিয়ানের মুখেও কয়েকটা রঙিন পোঁচ লাগিয়ে দিল একটা মেয়ে।

সাজানো শেষ হলে ছেলেদের আবার বাইরে নিয়ে এল ওঝা, অপেক্ষমাণ জনতাকে দেখাল।

সন্তুষ্টির গুঞ্জন উঠল জনতার মাঝে।

কুঁড়েতে ফিরে গেল আবার ওঝা।

যার যার কাজে গেল জনতা। একা হয়ে গেল ছেলেরা। কেউ নেই তাদের কাছে, কোন পাহারাদার নেই।

'ব্যাপার কি?' মুসা না বলে থাকতে পারল না। 'মাথামুণ্ড তো কিছুই বুঝছি না।'

'মুক্তি দিল নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ। নিশ্চয় কোন কারণ আছে এসবের।'

'মরুকগে!' মুখ ঝামটা দিল জিনা। 'গালে রঙ চড়চড় করছে। চলো, ধুয়ে ফেলিগে।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল কিশোর। 'অযথা লাগায়নি এগুলো। হয়তো কোন ধরনের ছাড়পত্র। এসো, পরীক্ষা করে দেখি।'

ধীরে ধীরে হেঁটে গাঁয়ের একদিকের সীমানায় চলে এল ওরা। তারপরে জঙ্গল। সেদিকে পা বাড়াতেই পথরোধ করে দাঁড়াল পাহারাদার। চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর নেই তার, কিছু বললও না।

সেদিক থেকে ফিরে এল ছেলেরা।

চারদিকেই গিয়ে দেখল। সব জায়গায় একই ব্যাপার ঘটল। বোঝা গেল, গাঁয়ের মধ্যে ওরা স্বাধীন, কিন্তু সীমানার বাইরে বেরোতে দেয়া হবে না।

'যাক,' কিশোর বলল, 'কিছুটা স্বাধীনতা তো মিলল। সুযোগ বুঝে পালানোর চেষ্টা করব।'

নতুন জীবন। মানিয়ে নিতে বাধ্য হলো অভিযাত্রীরা। প্রথম দিনের সেই কুঁড়েটাতেই ঘুমা । দিনের বেলা গ্রামের এখানে ওখানে কাটায়। কেউ কিছু বলে না।

তিন দিনের দিন তাদের ডাক পড়ল সর্দারের কুঁড়েতে। ওঝা তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এক এক করে তাদের মাথায় হাত রেখে দ্রুত কিছু বলল সর্দারকে। একটা শব্দ কয়েকবার উচ্চারণ করল : 'হামু।' কিশোরের ধারণা হলো, হামু সর্দারের নাম। সর্দারও একটা শব্দ বার বার বলল : বিটলাঙগোরুগা।

'মারছে রে! ওঝার নাম···' নিচু স্বরে বলতে গিয়ে বাধা পেল মুসা। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল কিশোর।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট হলো, সর্দারের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে ওঝার। দীর্ঘ আলোচনা শেষে ওঝা আবার ছেলেদের নিয়ে বেরিয়ে এল। খুশি খুশি মনে হলো তাকে।

কুঁড়েতে ফিরে কিশোর বলল, 'ওঝার ব্যাপারে অদ্ভুত কিছু লক্ষ করেছ?'

'কিছু কি? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। 'পুরোটাই অদ্ভুত। ওরকম অদ্ভুত মানুষ জিন্দেগীতে দেখিনি।'

'ওকথা বলছি না। জিভারোদের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে ওর, ঠিক মেলে না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'আমিও খেয়াল করেছি।'

'তা-তো হবেই,' মুসা বলল 'আলাদাই যদি না হলো, ওঝা কিসের? বিচিত্র পোশাক, অদ্ভুত ব্যবহার আর একটু রহস্য রহস্য ভাব যদি বজায় না রাখে, কেন ভয় করবে লোকে?'

'আমার মনে হয়েছে,' গাল ফুলিয়ে ভেঙচাল জিনা, 'আস্ত একটা ভাঁড়। একটা রামছাগল। শুধু জিভারো যোদ্ধাদের সঙ্গেই যা কিছুটা মিল রয়েছে···'

'কই আর মিল?' মুসা বলল। 'লেজেগুজে যেতে দেখলাম তো কয়েকটাকে সেদিন।'

ফিরে এল যোদ্ধারা। খালি হাতে। হাইজ্যাকারদের ধরতে পারেনি।

আশা হলো ছেলেদের। হয়তো সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবে জিম। তাহলে সাহায্য আসবে।

ওঝাকে নিয়ে আবার কথা উঠল।

'আমি আসলে বোঝাতে চাইছি,' কিশোর বলল। 'এ-গাঁয়ের জিভারোরা সাধারণ মানুষ। মনও তাদের ভাল। কিন্তু ওঝার স্বভাব, চালচলন কেমন যেন অন্যরকম। আর, সারাক্ষণ মুখে মুখোশ পরে রাখে কেন?'

'হয়তো চেহারা খুব কুৎসিত,' মুসা বলল। 'কিংবা মুখে বাজে কোন চর্মরোগ আছে। অথবা মুখে খোলা বাতাস লাগানো পছন্দ করে না সে।'

'এমনও হতে পারে, কর্তৃত্ব জাহির করার জন্যেই মুখোশ পরে সে,' রবিন বলল। 'কিংবা অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে ওটার।'

ওসব হয়তো-টয়তোর ধার দিয়ে গেল না জিনা, সাফ বলে দিল, 'ওর মুখটা আসলে তাপিরের মত, তাই ঢেকে রাখে।'

বিকেলে গাঁয়ের ভেতর বেড়াতে বেরোল ওরা। ওঝার কুঁড়ের ধার দিয়ে যাচ্ছে, এই সময় দুজন মেয়ের একজন বেরিয়ে হাত নেড়ে ডাকল তাদের।

দরজায় দেখা দিল ওঝা বিটলাঙগোরুগা। ইশারা করল।

'বিটলা ডাকছে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'বিটলামী করার জন্যে,' জিনার জবাব।

'তোমরা বেশি কথা বলো!' কড়া ধমক লাগাল কিশোর।

যেতে দ্বিধা করছে ছেলেরা।

'ভয় কি? এসো,' ইংরেজিতে বলল কেউ।

ঝট করে তাকাল সবাই। কে? ওঝা ছাড়া ধারেকাছে তো আর কেউ নেই? ইনডিয়ান মেয়েটাও ঢুকে গেছে আবার কুঁড়েতে।

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল ওঝা। ছেলেদের ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল। তারপর মেয়েদুটোকে কিছু বলল, বেরিয়ে গেল ওরা।

ছেলেরা ঢুকলে দরজা লাগিয়ে দিল ওঝা। আস্তে করে খুলে আনল মুখোশ।

'ইওরোপীয়ান!' চেঁচিয়ে উঠল বিস্মিত মুসা।

'আপনি ইংরেজি বলেছেন?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'কে আপনি?' জানতে চাইল জিনা।

কিশোর তেমন অবাক হয়েছে মনে হলো না, এ-রকম কিছুই যেন আশা করছিল সে।

হাসল ওঝা। বয়েস পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে, ধূসর চুল, হাসি হাসি নীল চোখ। মুখের চামড়া ফ্যাকাসে, সর্বক্ষণ মুখোশ পরে থাকে বলেই হয়তো। 'খুব চমকে দিয়েছি, না? আসলে আমি বিটলাঙগোরুগার অভিনয় করছি, বিটলা নই।' শব্দ করে হাসল সে।

কত কত বাজে কথা বলেছে ভেবে লজ্জা পেল মুসা আর জিনা, চোখ তুলে

ঢাকাতে পারল না।

'আমার নাম কারলো ক্যাসাডো। ছিলাম বৈমানিক, কপাল-দোষে হয়ে গেলাম জিভারোদের ওঝা।'

'আপনাকে আমি চিনেছি, স্যার,' কিশোরের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'আপনিই সেই বিখ্যাত কারলো ক্যাসাডো, দুর্ধর্ষ বৈমানিক হিসেবে যাঁর অনেক নামডাক। আপনার অনেক অভিযানের কাহিনী আমি পড়েছি। আপনার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদও...'

'পড়েছ, না? এই ব্রাজিলের জঙ্গলেই হারিয়েছি আমি,' বিষণ্ণ শোনাল বৈমানিকের কণ্ঠ।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'এঞ্জিনের গোলমাল। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল প্লেন। বেঁচে যে আছি এটাই আশ্চর্য। প্যারাসুটও আটকে গিয়েছিল, খুলল শেষ মুহূর্তে। আরেকটু দেরি হলেই গেছিলাম। পড়লাম একেবারে জিভারোদের সর্দার হামুর কুঁড়ের সামনে। ভেবেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেটে ফেলবে। তা-তো করলই না, আমাকে তোয়াজ শুরু করল। পরে বুঝেছি, নীল চোখ আর আকাশ থেকে পতনই আমাকে বাঁচিয়েছে। আমাকে ওরা কালুম-কালুম ভেবেছে।'

'কালুম-কালুম!' মুখ বাঁকাল মুসা।

'জিভারো ইনডিয়ানদের পবন,' কিশোর বলল তাকে। 'বাতাসের দেবতা।'

'বাহ, বুদ্ধিমান ছেলে,' প্রশংসা করল ক্যাসাডো। 'অনেক কিছু জানো।'

'ইনডিয়ানরা প্লেন দেখেনি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'দেখে, মাঝে-সাঝে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু ওগুলো কি জিনিস, জানে না ওরা। সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় নেই। আর প্যারাসুট তো দেখেইনি। আমার প্লেনটা গিয়ে পড়েছে ওখান থেকে অনেক দূরে, বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'ওদের ভুল ধারণা ভাঙলেন না কেন?'

'চেষ্টা করেছি, মানতে রাজি নয়। ওদের ধারণা, দেবতারা সহজে মানুষের কাছে ধরা দেয় না, তাই নানা রকম বাহানা করে। আমি কালুম-কালুম যদি না-ও হই, তার প্রেরিত দূত যে তাতে কোন সন্দেহ নেই ওদের।'

হেসে বলল মুসা, 'বাঘের সাজে যে সাজিয়েছেন আমাদের, আমরা তাদের কাছে কী? হালুম-হালুম?'

হেসে ফেলল ক্যাসাডো। 'হালুম-হালুম না হলেও অনেকটা ওরকমই। দেবতার বাচ্চা।'

'ওদের ভাষা শিখলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পর্তুগীজ ভাষার কিছু শব্দ মিশে গেছে ওদের ভাষায়। কিছু কিছু জিভারো জানতাম। শুরুতে কাজ চালিয়ে নিয়েছি। থাকতে থাকতে এখন পুরোপুরিই শিখে ফেলেছি।'

'আপনি চলে যান না কেন?'

'যেতে দেয় না। আমি নাকি ওদের সৌভাগ্যের ধারক। চলে গেলে আবার যদি দুর্ভাগ্য এসে ভর করে?'

'তাদের এ-বিশ্বাসের কারণ?' রবিন জানতে চাইল।

'আমি নেমেছিলাম সর্দারের কুঁড়ের সামনে। এমন এক সময়, যখন জিভারোদের দুঃসময় চলছে। বনে শিকার নেই, প্রচণ্ড খরা। এমনিতেই খাবারের খুব সমস্যা বেচারাদের, খরা কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেয়। খাওয়ার অভাব, লোক মরছে। ওই সময় আমি নামলাম। যেদিন এলাম, অনেক দিন পর সেদিনই পাঁচটা শুয়োর মেরে আনল শিকারীরা, তার পরদিন থেকে শুরু হলো বৃষ্টি। আসলে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখেই বনে জন্তু-জানোয়ারেরা ফিরে আসা শুরু করেছিল। ইনডিয়ানরা ভাবল, সব আমার দয়া। আমি বলেছি বলেই খাবার আর পানি দিয়েছে কালুম-কালুম। এ-রকম একজনকে কেন ছেড়ে দেবে ওরা?'

'তা-তো ঠিকই,' মুসা বলল। 'আমরা কালুম-কালুমের ছেলে, বলেছেন বুঝি তাদের?'

'তোমাদের ভালর জন্যেই বলতে হয়েছে,' হাসল বৈমানিক।

'সারাক্ষণ মুখোশ পরে থাকেন কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'থাকতেই হবে যখন, ভাবলাম ক্ষমতা নিয়েই থাকব। দেবতারা নাকি সহজে নিজেদের চেহারা মানুষকে দেখতে দিতে চায় না। তাই মুখোশ বানালাম। একমাত্র সর্দারের সামনে ছাড়া আর কারও সামনে খুলি না। এতে হামুও খুব খুশি, তাকে অনেক বড় সম্মান দেয়া হয়েছে বলে।'

'পালানোর কথা ভাবেন না?'

'ভাবি না মানে? পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এই গভীর জঙ্গল পেরিয়ে একা যাব কি করে? সভ্যতা অনেক দূর। সাহস হয় না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'কিন্তু তোমাদের কথা তো কিছু জানা হলো না? কে তোমরা? কি করে এলে?'

খুলে বলল সব কিশোর। মাঝে মাঝে কথা যোগ করল অন্য তিনজন।

'জিম, চ্যাকো আর ওরটেগা ফিরে যেতে পারলে আমাদের উদ্ধার করবে,' সব শেষে বলল জিনা।

'অনেকগুলো যদি আছে তাতে। যদি ফিরে যেতে পারে, যদি উদ্ধার করার ইচ্ছে থাকে, এবং যদি ওরা আসার আগেই আমাদের বলি না দিয়ে দেয় ইনডিয়ানরা,' মুসা বলল।

'অত নিরাশ হও কেন?' সান্ত্বনা মুসাকে নয়, নিজেকেই দিল আসলে কিশোর।

দীর্ঘ নীরবতা।

ক্যাসাডো ভাবছে।

রবিন চুপ।

জিনা চিন্তিত।

মনিবের চেহারা দেখে রাফিয়ানও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে, লেজ নাড়ছে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল ক্যাসাডো, 'আমার প্লেনের রেডিওটা যদি খালি পেতাম। এসওএস পাঠানো যেত।'

'আমরা যে প্লেনে এসেছি,' কিশোর বলল, 'তাতেও আছে রেডিও। ভাঙা, অর্ধেক মেরামত হয়েছে।'

সাত

'তাই নাকি?' ভুরু কোঁচকাল ক্যাসাডো। 'রেডিও?'

'অনেক চেষ্টা করেছি আমি আর ওরটেগা,' জানাল কিশোর। 'ঠিক করতে পারিনি।'

'আমি একবার দেখতে পারলে হত,' বলল ক্যাসাডো।

'এখান থেকে অনেক দূরে,' বিশেষ আশাবাদী হতে পারল না জিনা।

'না, বেশি দূরে নয়। প্লেনটা কোথায় পড়েছে, অনুমান করতে পারছি। ওই ইয়াপুরা নদী আর পাহাড়ের কথা যে বলছ, আমার চেনা। শর্টকাট আছে, এখান থেকে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে। অনেক এগিয়ে গিয়েছিলে তোমরা, ঘুরপথে, পিছিয়ে আনা হয়েছে আবার। আমি যাব প্লেনটা দেখতে।'

'বললেন না বেরোতে দেয় না?' কিশোর মনে করিয়ে দিল।

'দেয় না মানে, জিভারোদের ছেড়ে চলে যেতে দেবে না। কিন্তু গাঁয়ের বাইরে বেরোনোতে নিষেধ নেই, অবশ্য একলা বেরোতে দেবে না। কতবার শিকারে গেছি ওদের সঙ্গে। অনেক জায়গা চিনেছি।'

'তাহলে একলা যাবেন কি করে? আটকাবে না?'

হাসল ক্যাসাডো। 'আসলে একা বেরোনোর চেষ্টাই করিনি কখনও। একলা পালাতে পারব না, জঙ্গলে মরব, তাই। তবে চেষ্টা করলে যে ওদের চোখ এড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতে পারব না, তা নয়।'

গত কয়েক দিনের তুলনায় সে-রাতে ভাল ঘুম হলো ছেলেদের।

পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর-মন নিয়ে ঘুম ভাঙল।

রোজ নাস্তা নিয়ে আসে সে মেয়েমানুষটা, সে-ই নিয়ে এল সে-দিনও। ঝুড়ি নামিয়ে রেখে চলে গেল।

একটা পেঁপের নিচে ভাঁজ করা একটা কাগজ পাওয়া গেল। ক্যাসাডো লিখেছে :

> কাল রাতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। প্লেনটা খুঁজে পেয়েছি। একটা ভুল করেছিল ওরটেগা, রেডিওর একটা পার্টস উল্টো লাগিয়েছিল, ফলে ঠিক হয়নি। সেটা মেরামত করেছি। রেডিও কাজ করছে এখন। এসওএস-ও পাঠিয়েছি একটা। জবাব পাইনি। সূর্যাস্তের অপেক্ষায় রয়েছি। আবার গিয়ে মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করব।

খবর শুনে এত খুশি হলো, বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ নেচে নেয়ার লোভ সামলাতে পারল না মুসা আর জিনা। তাড়াহুড়ো করে নাস্তা সেরে কুঁড়ের বাইরে বেরোল। নাচতে শুরু করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাফিয়ান। তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, সেই সাথে ঘেউ ঘেউ। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার যোগাড় কিশোর আর রবিনের।

এই মজার কাণ্ড ইনডিয়ান ছেলেমেয়েদেরও দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ওরা। কাছে এসে সাহস পেয়ে তারাও যোগ দিল নাচে।

এল সর্দার হামুর ছেলে পুমকা। বয়েস ষোলো। খুব ভদ্র, শান্ত। তাকে অপছন্দ করার জো নেই। সে-ও নাচতে শুরু করল, হাসছে হা-হা করে।

এত হই-হল্লা কিসের! সর্দার মনে করল, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গেছে। কুঁড়ের দরজায় উঁকি দিল সে। দেখল, দেবতার ছেলেদের সঙ্গে তার ছেলের ভাব হয়েছে। খুব খুশি হলো সে। হেসে, আপনমনে মাথা দুলিয়ে আবার ভেতরে চলে গেল।

নাচতে নাচতেই কনুই দিয়ে মুসার পাঁজরে গুঁতো মারল জিনা। 'বোঝো এবার। এদের ভয়েই কিনা আমরা কেঁচো হয়ে ছিলাম। এই জিভারোদের মত ভদ্র জংলী—আর হয় না।'

'তা হোক,' মুসা বলল। 'তবু আমি থাকতে চাই না এখানে। দেখা যাক, ক্যানাডোর এসওএস-এর জবাব আসে কিনা।'

কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে ছেলেরা। ফলে মনের ভার অনেকখানি হালকা হয়েছে। সহজ ভাবে ইনডিয়ানদের সঙ্গে মিশতে পারছে।

প্রায় প্রতিদিনই ক্যাসাডোর সঙ্গে তার কুঁড়েতে দেখা হয়। আলাপ-আলোচনা হয়। সুযোগ পেলেই প্লেনে গিয়ে এসওএস পাঠায় বৈমানিক। যদিও একটা জবাবও আসেনি এখনও।

সময় কাটাতে এখন আর তেমন অসুবিধে হয় না গোয়েন্দাদের। ইনডিয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়েছে। বন্ধুত্ব হয়েছে পুমকার সঙ্গে। তার কাছে জিভারো ভাষা শিখছে ওরা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কাজ চালানোর মত ভাষা শিখে ফেলল দু-তরফই। মোটামুটি আলাপ করতে পারে। আর এই আলাপের মাধ্যমেই একদিন অদ্ভুত কিছু কথা শুনল অভিযাত্রীরা।

ভালমত বুঝিয়ে বলতে পারল না পুমকা, তত শব্দ দু-তরফের কারও স্টকেই জমা হয়নি এখনও। স্পষ্ট বোঝা গেল শুধু চারটে শব্দ : শুশুধন, মন্দির, চাঁদ এবং উপত্যকা।

কান খাড়া হয়ে গেল কিশোর পাশার। অনেক ভাবে জিজ্ঞেস করল পুমকাকে, বোঝানোর চেষ্টা করল।

পুমকা বুঝল ঠিকই, কিন্তু বলতে পারল না। আবার একই কথা বলল, 'হ্যাঁ

হ্যাঁ, গুপ্তধন। মন্দির। চাঁদ।'

'নাহ্, হবে না,' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। 'ক্যাসাডোকে জিজ্ঞেস করে দেখি, কিছু বলতে পারেন কিনা।'

ছেলেদের আগ্রহ দেখে হাসল ক্যাসাডো।

'পুরানো একটা জিভারো কিংবদন্তী,' বলল সে। 'সব কিংবদন্তীই তিল থেকে তাল হয়, তবে তিল একটা থাকে। এটাতেও বোধহয় রয়েছে। কোন্ কথাটা সত্যি আর কোনটা রঙ চড়ানো বোঝা মুশকিল। জঙ্গলের পরে এক পাহাড়ী উপত্যকায় অনেক পুরানো একটা মন্দির আছে, নাম চন্দ্রমন্দির। ইনকাদের মত একটা সভ্য জাতির বাস নাকি ছিল ওখানে, এখনও আছে ধ্বংসস্তূপ। সেখানেই আছে গুপ্তধন বা মূল্যবান কিছু। সম্ভবত দামী ধাতুর তৈরি দেব-দেবীর মূর্তি।

'দারুণ তো!' জিনা বলল।

'হুঁউ!' তার সঙ্গে একমত হলো রাফিয়ান, চোখে কৌতূহল।

'বা-বা, আলোচনায় যোগ দিতে চান মনে হয়? আরও শুনবি?' হেসে বলল ক্যাসাডো। 'পুরানো কিংবদন্তী, অথচ অনেক চেষ্টা করেও এতদিন গুপ্তধন খুঁজে পায়নি কেউ। এখন আর উৎসাহ নেই কারও। তাছাড়া গুপ্তধন দিয়ে করবেটাই বা কি তারা? কেউ আর খুঁজতে যায় না। ওসব ধনরত্ন কিংবা সোনাদানার চেয়ে শিকার খোঁজাই অনেক বেশি জরুরী প্রয়োজন ওদের।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' মাথা দোলাল কিশোর। 'তারমানে, গুপ্তধনের ব্যাপারে তাদের আগ্রহী করতে চাইলে, এমন কিছু বলতে হবে, যাতে স্বার্থ থাকবে জিভারোদের।'

'হ্যাঁ। এটাই তোমাদের সুযোগ। ওদের বোঝানো সহজ হবে, কারণ...' নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ হয়ে গেল সে, চোখ টিপল। আগ্রহ বাড়াচ্ছে ছেলেদের।

'কারণ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'জলদি বলুন!'

'কারণ, কিংবদন্তী আরও বলে, ওই গুপ্তধন খুঁজে পাবে কয়েকটা ছেলেমেয়ে।'

'বলেন কি?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রবিনের। 'তাহলে তো মস্ত সুযোগ। আজই গিয়ে বলুন না সর্দারকে, আমরা গুপ্তধন খুঁজতে যেতে চাই। বলবেন ওই গুপ্তধনের মধ্যে রয়েছে ওদের সৌভাগ্য।'

'রবিন ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল। 'অন্যভাবেও বলতে পারেন। বলবেন, ওই গুপ্তধনে রয়েছে কালুম-কালুমের আশীর্বাদ। আমরা থাকলে যতখানি সৌভাগ্য আসবে, গুপ্তধনগুলো তার চেয়ে বেশি সৌভাগ্য বয়ে আনবে। তাছাড়া ওগুলো অমর। দর কষাকষি করবেন, আমরা ওগুলো খুঁজে বের করে দেব, বিনিময়ে আমাদের মুক্তি দিতে হবে।'

'আস্তে, এত উত্তেজিত হয়ো না,' হাত তুলল ক্যাসাডো। 'গুপ্তধন খুঁজে পাবেই, এত শিওর হচ্ছ কেন? মন্দিরটার কাছে হয়তো নিয়ে যেতে পারবে জিভারো গাইড, কিন্তু গুপ্তধন বের করবে কি ভাবে? কোথায় খুঁজবে?'

'কোন নির্দেশ নেই?'

'আছে। কিন্তু শত শত বছর ধরে মুখে মুখে ফিরেছে কথাগুলো, কিছু বাদ পড়েছে, কিছু রঙ চড়েছে, বিকৃত হয়েছে। আসল সত্য বের করে নেয়া খুব কঠিন। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।'

'তবু, চেষ্টা করতে দোষ কি?' রহস্যের গন্ধ পেয়েছে কিশোর পাশা, তাকে থামানো এখন আরও অসম্ভব—কিন্তু সেকথা জানে না ক্যাসাডো। 'জায়গাটা নিশ্চয় এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তাহলে জিভারোদের কানে আসত না। মিস্টার ক্যাসাডো, আপনি গিয়ে বলুন সর্দারকে। চেষ্টা করে দেখি, তারপর যা হয় হবে।'

হাসল বৈমানিক। 'তা নাহয় বলব। কিন্তু লাভ কতখানি হবে জানি না। এমনও হতে পারে, বলতে পারে, হাতে যা আছে তা-ই ভাল, যেটা নেই সেটার পেছনে ছুটোছুটি করার দরকার নেই।'

'কিন্তু ওগুলো পাওয়ার পর তো আর "নেই" থাকবে না।'

'হুঁ, নাছোড়বান্দা ছেলে। ছেলেমী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিকই বলেছ, চেষ্টা করতে দোষ কি? কথায় আছে : ফরচুন ফেভারস দা ব্রেভ। হাহ।'

পর দিনই হামুর সঙ্গে দেখা করতে গেল বিটলাঙগোরগা।

অধীর হয়ে কুঁড়ের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেরা।

অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে এল ওঝা। মুখোশের জন্যে তার মুখ দেখা গেল না, দীর্ঘ আলোচনার ফল কি হয়েছে, আন্দাজ করা গেল না।

ইশারায় ডাকল ওঝা। ছেলেদের নিয়ে আবার কুঁড়েতে ঢুকল।

মাদুরে বসে রয়েছে সর্দার। পাশে তার ছেলে পুমকা, জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল বিদেশী বন্ধুদের দিকে।

উঠে এসে এক এক করে চারজনের গায়েই এক আঙুল রাখল সর্দার, কয়েকবার করে মাথা নাড়ল, সম্মান দেখাল দেবতার বাচ্চাদের।

পুমকাও উঠে এসে হাত মেলাল ইউরোপীয়ান কায়দায়, বন্ধুদের কাছে শিখেছে।

ব্যাপার দেখে হাঁ হয়ে গেল তার বাবার মুখ, চোখ বড় বড়। স্বর্গের রীতি শিখে ফেলছে তার ছেলে। ছেলের এত বড় সম্মানে গর্বে আধ হাত ফুলে উঠল হামুর বুক। সরল হাসিতে ভরে গেল মুখ।

'মনে হয় খবর ভাল,' ফিসফিস করে বলল জিনা।

অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে ছেলেদের নিয়ে তার কুঁড়েতে চলে এল ক্যাসাডো। মুখোশ খুলে হাসল।

সর্দারের সঙ্গে কি কথা হয়েছে শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ছেলেরা, রাফিয়ানও যেন খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। সে-ও বসল ছেলেদের পাশে, গম্ভীর ভাবভঙ্গি।

'হামুকে বুঝিয়ে বললাম,' ক্যাসাডো বলল। 'বললাম, তোমরা স্বর্গ থেকে এসেছ কালুম-কালুমের নির্দেশ নিয়ে। কিংবদন্তীর গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্যে।

প্রথমে বিশেষ গায়ে মাখল না হামু। তার কাছে গুপ্তধনের কোন মূল্য নেই। শেষে বললাম, কাল রাতে কালুম-কালুমের আদেশ পেয়েছি আমি।

'আল্লাহ্‌রে, কি কাণ্ড!' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা। 'এক আমেরিকায়ই মানুষে মানুষে কী ফারাক! এক অঞ্চলের মানুষ পাড়ি দিচ্ছে মহাশূন্য, আরেক অঞ্চলের মানুষ এখনও পড়ে আছে সেই গুহামানবের যুগে।'

'তা কি আদেশ এল কালুম-কালুমের কাছ থেকে?' হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কালুম-কালুম তো বাতাসের দেবতা, নাকি?' কাসাভোও হাসছে। 'গত রাতে ঝড়ো হাওয়া বয়েছে, টের পেয়েছ? সেটাই বললাম হামুকে : বাতাসের মধ্যে রয়েছে জিভারোদের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য। ওগুলো একবার এনে তুলতে পারলে, শিকারের আর কোন দিন অভাব পড়বে না, দীর্ঘজীবী হবে জিভারোরা, শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে প্রতিবারেই জিতবে—কখনও হারবে না।'

'তারমানে আমরা এখন খুব দামী বস্তু হয়ে গেলাম ওদের কাছে,' রবিন মন্তব্য করল। 'এ-জন্যেই এত সম্মান দেখিয়েছে মিস্টার হামু।'

'হ্যাঁ।'

'আসল কথা কি বলল?' আর তর সইছে না কিশোরের। 'যেতে দেবে?'

'যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়, দেবে মুক্তি। পথ দেখিয়ে উপত্যকায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক দেবে। এত উত্তেজিত হয়েছে, মোটেই দেরি করতে চায় না, পারলে এখুনি রওনা হয়। পাওয়া গেলে কথা রাখবে হামু, জঙ্গল পেরোতে সাধ্যমত সাহায্য করবে তোমাদের। তখন কোন একটা ছুতোয় আমিও সঙ্গে যাব তোমাদের।'

খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক হামু। কোন ব্যাপারে হুট করে উত্তেজিত হয় না। ভেবে-চিন্তে কাজ করে। কিন্তু কোন ব্যাপারে যদি একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, সেকাজ থেকে আর ফেরানো যায় না তাকে, শেষ না দেখে ছাড়ে না।

বিট্‌লাঙগোরুগা বলেছে, ছেলেরা এসেছে গুপ্তধন খুঁজে বের করে জিভারোদের চিরসৌভাগ্য বহাল করার জন্যে, এর চেয়ে খুশির খবর আর কি হতে পারে হামুর জন্যে?

এতবড় দায়িত্ব, যাকে তাকে সঙ্গে নেয়া যায় না। বেছে বেছে লোক ঠিক করল হামু। সবাই ভাল যোদ্ধা, তার খুব বিশ্বস্ত। পুমকাকেও নেবে সঙ্গে।

আনন্দে উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল পুমকা। গাঁয়ের ছেলেরা তার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। সেদিন থেকে অভিযাত্রীদের কাছছাড়া হয় না সে পারতপক্ষে, ওরা যেখানে যায়, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

'একেবারে আরেক রাফিয়ান,' জিনা মন্তব্য করল।

কিন্তু এসব হালকা রসিকতায় কান দেয়ার মানসিকতা নেই কিশোরের। রবিন আর মুসাও বুঝতে পারছে, কতখানি জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি।

'গুপ্তধন পাওয়া গেলে তো খুবই ভাল, বাঁচলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু যদি না

পাই, কি হবে ভেবে দেখেছ? ক্যাসাডোর কি অবস্থা হবে? হামু ধরে নেবে, তার সঙ্গে মিথ্যাচার করা হয়েছে, তাকে ফাঁকি দেয়া হয়েছে, ঠকানো হয়েছে। ঠাণ্ডা মানুষ রাগলে ভয়ানক হয়ে যায়। দেবতার কাছ থেকে এসেছি আমরা, সে-বিশ্বাস হারাবে হামু। ধরে লোজা বলি দিয়ে ফেলবে তখন।'

'তাই তো, এটা তো ভাবিনি!' নিমেষে হাসি হাসি মুখটা কালো হয়ে গেল জিনার।

'যা হবার হবে,' মুসা বলল। 'আমার বিশ্বাস, তুমি ওগুলো খুঁজে পাবেই।'

'বেশি ভরসা করছ মুসা,' কিশোর বলল। 'যদি সত্যি থাকে, হয়তো পাব। কিন্তু যদি না থাকে?'

আট

ধাঁধার তিনটে অংশ, সাবধানে নোট করে নিল কিশোর। ক্যাসাডোর মুখে শুনেই মুখস্থ করে ফেলেছে, তবু লিখে নিল। অনেক সময়, লেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক জটিল রহস্যের গিট খুলে যায়, কিশোরের বেলায়ই কয়েকবার ঘটেছে এই ঘটনা।

বন্ধুদেরকে নিয়ে গাঁয়ের ধারে বিশাল এক গাছের ছায়ায় এসে বসল সে। ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা করবে। খানিক দূরে বসে উৎসুক হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইল রাফিয়ান আর পুমকা।

দূরে কুঁড়ের দরজায় বসে এদিকেই ফিরে রয়েছে ক্যাসাডো। সে কি ভাবছে, জানে না ছেলেরা। সে ভাবছে, কাজটা খুব খারাপ হয়ে গেল। নিজের ওপরই রেগে গেছে। যাওয়ার সব যোগাড় করে ফেলেছে হামু, এখন তাকে আর কিছুতেই ফেরানো যাবে না, কিছু বলেই বোঝানো যাবে না। যেতে না চাইলে খারাপ অর্থ করবে। ভাল বিপদেই পড়া গেছে। কেন যে বাচ্চাদের কথায় নাচলাম! ধাঁধা সমাধানের চেষ্টা তো আমিও অনেক করেছি। পেরেছি? কয়েকটা ছেলে পারবে, কেন বিশ্বাস করতে গেলাম?

ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে কিশোর। সামনে খোলা নোটবুক। 'পুকুরের ঠিক মাঝখানে পড়বে সূর্য,' বিড়বিড় করল সে। 'তারপর পশ্চিমে দেখতে পাবে অস্তপ্রায় চন্দ্র। তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে। মানে কি?'

কেউ জবাব দিল না।

'তিনটে ধাঁধা,' আবার বলল সে, 'একটার সঙ্গে আরেকটা কোনভাবে গাঁথা।'

'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে,' রবিন বলল। 'দ্বিতীয় ধাঁধাটা শুরু হয়েছে তারপর দিয়ে। তৃতীয়টা শুরু হয়েছে তারও পরে দিয়ে। সিরিয়াল ঠিকই আছে।'

'হুঁম!' মাথা দোলাল জিনা।

মুসা কিছুই বলল না। মাথাখাটানো নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই তার, ধাঁধা আর বুদ্ধির কচকচি ভালও লাগে না।

'পুকুর তো বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু তাতে সূর্য পড়ে কিভাবে?'

'সূর্য ডোবার কথা বলেনি তো?' রবিন বলল।

'সেটাও অসম্ভব, পুকুরে সূর্য ডোবে না।'

'তাহলে কথাটা হয়তো অন্য কিছু ছিল, মুখে মুখে বিকৃত হয়েছে।'

'তা হতে পারে,' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'কথাটা হয়তো ছিল রোদ পড়ে···না না, তা-ও না, রোদ পড়লে শুধু মাঝখানে পড়বে কেন? সারা পুকুরেই পড়বে। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, পুকুরের মাঝখানে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়াকে বুঝিয়েছে। তীরে দাঁড়িয়েই হয়তো দেখা যায় সেটা।'

'ঠিক বলেছ!' নিজের উরুতে চাপড় মারল রবিন। 'দুপুর বেলা পুকুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়তেই পারে। পুকুরটা খুঁজে বের করব। তারপরের ধাঁধাটা?'

'তারপর পশ্চিমে দেখতে পাবে অস্তপ্রায় চন্দ্র,' পড়ল কিশোর।

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল রবিনের। 'এইটা কি ভাবে সম্ভব? এর কোন মানেই হয় না। ধরা যাক, পুকুরটা আমরা খুঁজে পেলাম, যাতে ঠিক দুপুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু ওই সময় চাঁদ দেখব কি করে, তা-ও পশ্চিমে, আবার অস্তগামী? তারও ওপর রয়েছে জঙ্গল, উঁচু উঁচু গাছ, সত্যি সত্যি যখন অস্ত যায়, তখনও তো দেখা যাবে না।'

'ভূগোলের কোন গোলমাল হয়তো আছে ওই এলাকায়,' মিনমিন করে বলল মুসা।

'আরে দূর!' ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল যেন রবিন। 'যত ভৌগোলিক গোলমালই হোক, দুপুরবেলা চাঁদ ডুবতে দেখা যায় না।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'কিশোর, কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বুঝতে পারছি না। এখানে বসে মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে না। পুকুরটা খুঁজে বের করার পর হয়তো কিছু বোঝা যাবে।'

'ওটা কোথায় আছে, কি করে জানছ?'

'ক্যাসাডো বলল না, এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা জলা জায়গা আছে। পুকুরটা সম্ভবত ওখানে। চারপাশে জঙ্গল ঘিরে রাখলে রোদই পড়বে না ঠিকমত, থাকত সূর্যের প্রতিবিম্ব।'

'কিন্তু ওখানে যাওয়া খুব কঠিন, ক্যাসাডো একথাও বলেছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, নানারকম হিংস্র জানোয়ার আছে, বিষাক্ত পোকামাকড় আছে। যেতে অনেক সময়ও লাগবে।'

'লাগুক না,' কিশোর বলল। 'সময়ের তোয়াক্কা কে করছে? সময়টা আমাদের জন্যে কোন সমস্যা না, যত খুশি লাগুক। হ্যাঁ, এবার তৃতীয় ধাঁধাটা কি বলে দেখি।'

নোটবুকটা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে পুমকা। সাদা কাগজে বিজিবিজি কালো অক্ষরগুলো খুদে গোবরে পোকার মত লাগছে তার কাছে, ব্যাপারটা ভারি মজার আর রহস্যময় মনে হচ্ছে।

তার হাত থেকে নোট বই নিয়ে ধাঁধাটা বের করে পড়ল কিশোর, 'তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী, তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে।'

'এটা সহজ,' জিনা বলল।

'তাই মনে হচ্ছে?' মুসার কাছে সহজ লাগছে না।

'তাই তো।'

'কি?'

'গুপ্তধন। হলুদ দেবী মানে হলুদ কোন মূর্তি-টূর্তি হবে, আইডল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' জিনার কথায় সায় দিল রবিন। 'হলুদ বলেছে তো, তার মানে সোনার মূর্তি।'

'আর সবুজ চোখ কোন মূল্যবান পাথর?' মুসার প্রশ্ন।

'সম্ভবত পান্না,' কিশোর জবাব দিল। 'ব্রাজিলে এক সময় খনি থেকে দারুণ দারুণ পান্না তোলা হত। হয়তো প্রাচীন সেই সভ্যতার যুগে...'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না মুসা। 'হুররে!' বলে চেঁচিয়ে উঠে নাচতে শুরু করল। 'হয়ে গেছে কাজ। সমাধান করে ফেলেছি আমরা।'

কিছুই বুঝল না পুমকা, কিন্তু মুসার আনন্দ সংক্রামিত হলো তার মাঝে। সে-ও লাফাতে শুরু করল। যোগ দিল রাফিয়ান। জিনা আর বসে থাকে কি করে? রবিনই বা কেন বসে থাকবে? বসে রইল শুধু কিশোর। সে বুঝতে পারছে, আসলে কোন সমাধান হয়নি। এত সহজ নয় ব্যাপারটা। কিন্তু সেটা বলে বন্ধুদের আনন্দে বাধা দিতে চাইল না।

কুঁড়ের দরজায় বসে ছেলেদের আনন্দ দেখে ক্যাসাভোর মুখও উজ্জ্বল হলো। সে ধরেই নিল, ধাঁধার সমাধান হয়ে গেছে। উঠল। পায়ে পায়ে এগোল সে, জানার জন্যে।

উত্তেজনা চরমে পৌঁছল। হামু দলবল নিয়ে তৈরি।

ওঝা বিট্‌লাঙগোরুগার নির্দেশ মত শুভদিন শুভক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়ল দলটা।

জিভারো গাঁয়ের মাইল কয়েক পর থেকেই শুরু হলো ঘন জঙ্গল। লতা এমন ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে হাঁটাই মুশকিল।

শুরুতে যা ছিল, তার চেয়ে গতি অনেক কমে গেল।

আগে আগে চলেছে কয়েকজন জিভারো যোদ্ধা, ওরা পথ-প্রদর্শক। তাদের পেছনে সর্দার হামু আর তার ছেলে, ঠিক পেছনেই ওঝা। তার পরে মালপত্র-বাহকদের সঙ্গে ছেলেরা। রাফিয়ান তাদের পাশেই চলছে।

ওরা যেদিন রওনা হয়েছে, তার আগের দিন প্লেনে গিয়ে শেষবারের মত এস ও

এন পাঠিয়েছে ক্যাসাডো, কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোন জবাব মেলেনি।

'হলো না!' ফিরে এসে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলেছে বৈমানিক। 'থাকগে, যা হওয়ার হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না আমাদের। ফিরে এসে আবার যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাব। অবশ্য যদি ফিরতে পারি। যা ভয়ানক জঙ্গল।'

সামনে যারা চলেছে, তাদের হাতে ভোজালির মত বড় ছুরি। ওগুলো দিয়ে ঘন ঝোপ আর লতা কেটে পথ করে নিচ্ছে। খুব কষ্টকর আর ধীর কাজ।

অসহ্য ভ্যাপসা গরমে ঘামছে ছেলেরা। আঠা আঠা হয়ে যাচ্ছে সে ঘাম, ভীষণ অস্বস্তি হয়।

রাফিয়ানেরও জিভ বেরিয়ে পড়েছে, হাঁপাচ্ছে। এই গরম সে-ও সইতে পারছে না।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কুঁজো করে ফেলেছে পিঠ। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে। জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে, চাপা ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলার গভীর থেকে।

কুকুরটার মতই দাঁড়িয়ে গেছে জিভারোরা। জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। রাফিয়ানের মতই বিপদের গন্ধ পেয়েছে ওরাও।

'জাগুয়ার!' ফিসফিস করে বলল ক্যাসাডো।

'ব্রাজিলের জঙ্গলের ভয়ঙ্করতম জানোয়ার জাগুয়ার,' বলল মুসা। ইদানীং জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে। কারণও আছে। তার বাবা মিস্টার রাফাত আমানের মাথায় ঢুকেছে, জানোয়ারের ব্যবসা সাংঘাতিক লাভজনক। দেশবিদেশ থেকে দুর্লভ জানোয়ার ধরে এনে বিভিন্ন চিড়িয়াখানা, সার্কাস পার্টি আর জন্তুজানোয়ার পোষার সংগঠনগুলোতে বিক্রি করা যায়, যথেষ্ট চাহিদা। লস অ্যাঞ্জেলেসে মাত্র একজন ব্যবসায়ী আছে, তা-ও খুব ভাল ব্যবসায়ী নয়, চাহিদামত সরবরাহ করতে পারে না। ব্যবসাটা খুব মনে ধরেছে মুসার বাবার। সেটা আবার কথায় কথায় জানিয়েছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশাকে। ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসার দিকে এমনিতেই ঝোঁক রাশেদ চাচার, মুসার বাবার কথায় লাফিয়ে উঠেছেন, পার্টনারশিপে ব্যবসা করবেন দু-জনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। স্যালভিজ ইয়ার্ডের দুই কর্মচারী বোরিস আর রোভারের সাহায্যে অনেকখানি জায়গার জঞ্জাল পরিষ্কার করে সেখানে জানোয়ার রাখার খাঁচাও বসাতে শুরু করেছেন। পড়াশোনা শুরু করেছেন মিস্টার আমান, তাঁর দেখাদেখি মুসাও। জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে যত বই পাচ্ছেন সব কিনে এনে পড়ে ফেলছেন। কিভাবে ধরতে হবে, সেটা জানার জন্যে, 'প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং' নিচ্ছেন মাস্টার রেখে। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছে মুসা। এই জন্তুজানোয়ার ধরে এনে বিক্রি করার ব্যবসা কতখানি লাভজনক হবে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই কিশোর বা মুসার, কিন্তু সাংঘাতিক সব অভিযানে বেরোতে পারবে বুঝতে পেরে ভীষণ আগ্রহী হয়েছে ওরাও। রাশেদ চাচার সংগ্রহ করা বইগুলো প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে কিশোর।

'কত বড় হয়?' জানতে চাইল জিনা।

'পূর্ণবয়স্ক জাগুয়ার দেড়শো কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়,' গড়গড় করে মুখস্থবিদ্যা ঝাড়ল মুসা। 'প্রচণ্ড শক্তি। গতি আর ক্ষিপ্রতা চমকে দেয়ার মত। আর রক্ত···রক্ত··· চিতার মত। চিতা বাঘের মত ফুটকি···'

ভয়ঙ্কর শব্দ হলো। তুলনা করা কঠিন। নাম শুনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়নি ছেলেদের, কিন্তু ডাক শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। ডাকই যার এমন, কতখানি ভয়ানক জানোয়ার সে!

ইশারায় সবাইকে চুপ থাকতে বলে হাতের রাইফেলটা শক্ত করে চেপে ধরল হামু। পা টিপে টিপে এগোল চিৎকারটা যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

ভেবে অবাক হয় কাসাডো, রাইফেল আর গুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করে হামু? অনেক চেষ্টা করেছে বৈমানিক, রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে তার কাছে। জানতে পারেনি।

পাথর হয়ে গেছে যেন সবাই। চোখের পাতা নাড়তে ভয় পাচ্ছে। এক চিৎকারেই কাঁপুনি তুলে দিয়েছে জাগুয়ার।

গোঁ গোঁ করেই চলেছে রাফিয়ান, ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে। শক্ত করে তার কলার চেপে ধরে রেখেছে জিনা। কোনভাবেই গোঙানি থামাতে না পেরে শেষে মুখ চেপে ধরল।

একটি মাত্র গুলির শব্দের পর অখণ্ড নীরবতা।

হাসিমুখে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হামু।

এই হাসির অর্থ জানা আছে জিভারোদের। শোরগোল তুলে ছুটে গিয়ে ঢুকল বনের ভেতরে। বেরিয়ে এল খানিক পরেই। টানতে টানতে নিয়ে এসেছে শিকার।

জানোয়ারটা আসলেই বড়!

অনেকক্ষণ ধরে নানাভাবে সর্দারের প্রশংসা করল যোদ্ধারা। তারপর জাগুয়ারের ছাল ছাড়িয়ে মাংস কেটে ভাগাভাগি করে কাঁধে তুলে নিল।

আবার শুরু হলো চলা। জাগুয়ারের ডাক আর চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে ছেলেরা, চুপসে গেছে ফাটা বেলুনের মত। শুরুতে যে হালি হালি ভাবটা ছিল, এখন আর নেই।

দুই দিন পর শুরু হলো জলাভূমি।

গত দু-দিনের যাত্রাটা সুখকর হয়নি মোটেও। আঠাল গরম, ভেজা পথ, মশা তাড়ানোর জন্যে রাতে ক্যাম্পের আগুনের ধোঁয়া, সারাক্ষণ হিংস্র জানোয়ারের আনাগোনা, ভাল লাগার কথাও নয়। জাগুয়ারটা মারার পর থেকে হাঁটার সময়ও স্বস্তি পায়নি ছেলেরা। মনে হয়েছে, এই বুঝি অন্ধকার কোন ঝোপ থেকে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ল আরেকটা জাগুয়ার।

ব্রাজিলের জঙ্গলের জলা কেমন, অস্পষ্ট ধারণা আছে বটে ছেলেদের, কিন্তু

এতখানি খারাপ, কল্পনাও করেনি। এখনও ভালমত শুরু হয়নি জলাভূমি, তাতেই এই অবস্থা, আসল জায়গায় গেলে কেমন হবে ভেবে ভয় পেল ওরা।

বড় বড় গাছ ডালপাতা ছড়িয়ে রেখেছে, প্রায় প্রতিটি গাছের নিচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে অসংখ্য নালা, নালার জাল বলা চলে। বনতলে আবছা অন্ধকার, বাষ্প উঠছে। এত আঠা করে দেয় শরীর, গায়ে জামাকাপড় রাখাই দায়—কেন শুধু পাতার আচ্ছাদন কোমরে জড়ায় এখানকার ইনডিয়ানরা, বোঝা গেল। যেখানে পানি নেই, সেখানটাও শুকনো নয়, প্যাচপেচে কাদা। পচা পাতার গন্ধে বাতাস ভারি। ওসব পাতার ভেতরে ভেতরে কিলবিল করছে জোঁক আর নানারকম পোকামাকড়, কোন কোনটা সাংঘাতিক বিষাক্ত।

'আস্ত নরক!' নাক কুঁচকাল জিনা। 'এসব জায়গায় মানুষ আসে নাকি!'

'তাহলে আমরা এলাম কেন?' ভুরু নাচাল মুসা, 'আমরা কি মানুষ নই?'

'আমরা কি আর ইচ্ছে করে এসেছি? ঠেকায় পড়ে।'

জবাব নেই মুসার। চুপ হয়ে গেল।

চওড়া একটা খালের ভেজা তীর ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে লাফিয়ে সরে এল রবিন। ঝপাং করে গিয়ে পানিতে পড়ল একটা জীব। গাছের গুঁড়ি মনে করে ওটার ওপর পা দিয়ে ফেলেছিল সে।

'অ্যালিগেটর!' আবার বিদ্যা ঝাড়তে শুরু করল মুসা। 'খুব পাজি জীব। দেখেশুনে পা ফেলবে।'

কিন্তু খানিক পরেই মুসা নিজে যখন একটা অ্যালিগেটরের ওপর পা ফেলল, আর ঝাড়া দিয়ে তাকে উল্টে ফেলে পালাল ওটা, হাত ধরে টেনে তুলে গম্ভীর মুখে বলল রবিন, 'অ্যালিগেটর যে কুমিরের এক প্রজাতি, তা কি জানো? বড়গুলো মানুষখেকোও হয়। ঠিকই বলেছ, খুব পাজি জীব। সুতরাং, সাবধান, কানার মত পা ফেলো না। শেষে অ্যালিগেটরের নাস্তা হয়ে যাবে।'

হেসে উঠল জিনা আর কিশোর, খুব একহাত নিয়েছে রবিন।

ক্যাসাডোও হাসি চাপতে পারল না।

ইনডিয়ানরা তো দাঁত বের করে হাসছে মুসার অবস্থা দেখে।

বেশ অনেকখানি পথ পেরোল সেদিন দলটা। খালের পাড়ের কুচকুচে কালো মাটি নরম, স্পঞ্জের মত, পা পড়লে দেবে যায়। তোলার সময় আবার কামড়ে ধরে রাখে। কলা পাতা কেটে আনল ইনডিয়ানরা। সেগুলো দিয়ে পা মুড়ে লতা দিয়ে বাঁধল। এই আদিম জুতো বেশ কাজের। কাদা লাগে না, মাটির কামড় বসে না। তাছাড়া পোকামাকড়ের কামড়ও ঠেকায়।

রবিনের আহত গোড়ালি আবার ব্যথা শুরু করেছে। জ্বর জ্বর লাগছে তার।

'পুকুরটা কোথায় পাওয়া যাবে?' বিকেলের দিকে বলল সে। 'আর তো পারি না। খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার অবস্থা।'

'ডজন ডজন পুকুর আর ডোবা তো পেরিয়ে এলাম,' বলল জিনা।

'হ্যাঁ,' কিশোর চিন্তিত। 'ওগুলোর কোনটাই নয়। এই কালো আর ঘোলা ওগুলোর পানি, চারপাশে জঙ্গল ঘিরে রেখেছে, ওগুলোতে রোদই পড়ে না ঠিকমত। মাঝদুপুরে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে কি করে? তাছাড়া ওগুলোর ধারেকাছে কোন পাহাড় নেই।'

'তবে,' রবিন বলল, 'মনে হয়, পেয়ে যাবই। কিশোর, আরেকটা কথা ভেবেছ? ধাঁধা অনেক পুরানো। যখনকার কথা, তখন হয়তো পুকুরপাড়ে গাছ ছিল না। কিন্তু এতদিনে কি জন্মায়নি? কে সাফসুতরো করে রাখতে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাসাডো। 'যুক্তি আছে কথায়। কিন্তু আমার ধারণা, আরও বড় কোন পুকুর, কিংবা ছোটখাট হ্রদের কথা বলা হয়েছে। যা দেখলাম ওগুলো সবই প্রায় ডোবা। যারা এই ধাঁধা বানিয়েছে, তারা যে বুদ্ধিমান ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। যখন দেখল, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে, গুপ্তধনগুলো লুকিয়ে ফেলল। সেই তারা বোধহয় চন্দ্রমন্দিরের ধর্মগুরুর দল। কেন লুকিয়েছে, তারাই জানে। তবে নিশ্চয় এমন কোথাও লুকায়নি, সহজেই যেখানকার চিহ্ন মুছে যাবে, অল্প কিছুদিন পরেই আর চেনা যাবে না। তারমানে, ধরে নেয়া যায়, এমন কোথাও লুকিয়েছে, অনেক বছর পরেও যে জায়গাটা নষ্ট হবে না।'

'সেটা হলেই ভাল,' জিনা বলল।

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' ক্যাসাডোকে বলল কিশোর। 'তা-ই করা হয়েছে।'

পরদিন ইয়াপুরার একটা শাখা-নদীর তীরে পৌঁছল ওরা।

সরু নদী, খালই বলা চলে। এক ধারে জলা, অন্য ধারে ঘন জঙ্গল, কোথাও কোথাও অনেক সরে গেছে গাছপালা। ওসব জায়গায় বনের সীমানা আর পানির সীমানার মাঝে শুকনো চরা, আঠাল মাটির নাম নিশানাও নেই। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। একই জায়গায় শতরূপ।

গত কয়দিনে কাহিল হয়ে পড়েছে গোয়েন্দারা। সেটা দেখে হামুর সঙ্গে পরামর্শ করল ক্যাসাডো। সর্দার দেখল, শুধু দেবতার ছেলেরাই নয়, তার নিজের ছেলেও কাহিল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া খাবার ফুরিয়ে এসেছে, শিকার করা দরকার। ভেবেচিন্তে পুরো একটা দিন বালির চরায় বিশ্রামের কথা ঘোষণা করল হামু। ছেলেরা বিশ্রাম করবে, তাদের সঙ্গে থাকবে কুলিরা। যোদ্ধারা শিকারে যাবে।

দলবল নিয়ে শিকারে চলে গেল হামু।

আগুন জ্বেলে রান্নায় ব্যস্ত হলো কুলিদের কেউ, কেউ ব্রেফ হাত-পা ছড়িয়ে বসে রইল।

জায়গাটা সুন্দর। ঝকঝকে সাদা বালি। নদীর পানিও টলটলে পরিষ্কার।

ক্যাসাডো আর মুখোশ রাখতে পারছে না মুখে। কত আর পারা যায়? গাঁয়ে থাকতে তো রাতের বেলা অন্তত খুলে রাখতে পারত। কিন্তু অভিযানে বেরোনোর পর সবার সঙ্গে একসাথে ঘুমাতে হয়, ফলে খুলতে পারে না।

কিন্তু এই গরমের মধ্যে নদীর পানির হাতছানি আর ঠেকাতে পারল না। কুলিদের কাছ থেকে সরে এল। এক জায়গায় পুমকা আর ছেলেরা বসে আছে। সেখানে এসে মুখোশ খুলে ফেলল সে।

ওঝার মুখ দেখতে পারায় নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করল পুমকা।

'গোসল করবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল কাসাডো।

ছেলেরাও সে-কথাই ভাবছিল, সে বলার পর আর দেরি করল না। জিনা ছাড়া বাকি সবাই টান দিয়ে দিয়ে কাপড় খুলে ফেলল। পুমকার কাপড়ই নেই, কোমরের আচ্ছাদন খোলার দরকার হয় না। কাপড়ের মত ভেজে না। পানি লাগলে ঝাড়া দিলেই পড়ে যাবে।

নদীতে নামার আগে ভালমত দেখে নিল ওরা, নিশ্চিন্ত হয়ে নিল যে ওখানে অ্যালিগেটর নেই।

দাপাদাপি শুরু করল সবাই। ডুব দিচ্ছে, একে অন্যকে পানি ছিটাচ্ছে।

সব চেয়ে বেশি খুশি রাফিয়ান।

'কুত্তাটা খুব ভাল,' বলল পুমকা।

খুশি হলো জিনা। 'একটা ডাল ছুঁড়ে দিয়ে দেখো না, কেমন সাঁতরে গিয়ে নিয়ে আসে। যত দূরেই ফেলো, নিয়ে আসবে।'

নতুন ধরনের একটা খেলা পেয়ে গেল পুমকা। বার বার ডাল ছুঁড়ে ফেলে পানিতে, সাঁতরে গিয়ে নিয়ে আসে রাফিয়ান। নদীটা তেমন চওড়া নয়। জোরে একটা ডাল ছুঁড়ে মারল পুমকা। অন্য পাড়ের কাছে গিয়ে পড়ল ডালটা। চেঁচিয়ে বলল পুমকা, 'যাও তো দেখি, নিয়ে এলো। বাপের ব্যাটা বলব তাহলে।

এটা একটা কাজ হলো নাকি? এত সহজেই যদি 'বাপের ব্যাটা' হওয়া যায়, ছাড়ে কে? রওনা হয়ে গেল রাফিয়ান। হাসিমুখে চেয়ে আছে সবাই।

অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে রাফিয়ান, হঠাৎ হাসি মুছে গেল পুমকার মুখ থেকে।

তার এই পরিবর্তন লক্ষ করল জিনা। পুমকার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে তারও মুখের রঙ পাল্টে গেল। বড় বড় হয়ে গেল চোখ, তাতে আতঙ্ক।

মস্ত এক সাপ। একটা গাছের ডাল থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে রাফিয়ানের দিকে। কুকুরটা টের পায়নি।

মুসাও দেখেছে সাপটা। 'অ্যানাকোণ্ডা!' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সাপ। এক নম্বর হারামী।'

'ক্যানোডি···ক্যানোডি!' অ্যানাকোণ্ডার জিভারো নাম। দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে পুমকার, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘেউ ঘেউ শুরু করল রাফিয়ান, দেখে ফেলেছে সাপটাকে।

'খালি সাপের বয়ান দিচ্ছ তোমরা,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'কিছু একটা করা দরকার।'

পাঁচ-ছয় মিটার লম্বা হবে সাপটা। ভীষণ মোটা। জলপাই-সবুজের ওপর কালো ফুটকি।

'জলদি!' মুসা বলল। 'পুমকা, কুলিদের ওখান থেকে লাঠি নিয়ে এসো কয়েকটা। কুইক!' বইয়ে পড়েছে কি করে বড় সাপ তাড়াতে হয়।

এক দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা লাঠি নিয়ে এল পুমকা।

একটা লাঠি নিয়ে বলল মুসা, 'আমি যা করব, সবাই করবে। ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করব।'

লাঠি দিয়ে গায়ের জোরে পানি পেটাতে শুরু করল ছেলেরা, ক্যাসাডোও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল সকলেই।

'মুসা, অযথা চেঁচাচ্ছি,' জোরে বলল রবিন। 'সাপের কান নেই, শব্দ শোনে না।

'তাই তো! ঠিক আছে, পেটানো থামিও না। কম্পন টের পাবে। ভড়কে যেতে পারে।

ঠিকই বলেছে মুসা।

সাপটা বোধহয় ভাবল : *আহ্, এ-কি জ্বালাতন! কি কাঁপাটাই না কাঁপছে পানি। ঝড় উঠল নাকিরে বাবা? শুরু করেছে কি দু-পেয়ে জীবগুলো? যে চারপেয়েটাকে ধরতে যাচ্ছি, সেটাকেও তো চিনতে পারছি না। বানর কিংবা শুয়োরের মত মোটেও নয়। খেতে কেমন লাগবে কে জানে?*

দ্বিধা করছে সাপটা। তারপর সিদ্ধান্ত নিল : *এই জঘন্য জায়গা থেকে চলে যাওয়াই ভাল। খাওয়ার সময় এত গণ্ডগোল ভাল লাগে? যাই, অন্য কোথাও গিয়ে কিছু ধরে শান্তিতে খাই।*

গাছের ডালে আর ফিরে গেল না সাপটা। পানিতে নেমেছে তো নেমেছেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। ধীরে ধীরে ভেসে চলল ভাটির দিকে।

জিনার ডাকে ফিরে আসছে রাফিয়ান, নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে।

মোড়ের কাছে গিয়ে কোণাকুণি সাঁতরাতে শুরু করল সাপটা। দ্রুত হারিয়ে গেল ওপাশে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। 'মুসা, তোমার জন্যেই রাফিয়ান বাঁচল আজ!'

নয়

সবাই প্রশংসা করছে মুসাকে।

রবিন বলল, 'তোমার বই-পড়া কাজে লাগছে। মনে হচ্ছে শিকারী হিসেবে নাম কামাবে। জানোয়ারের ব্যবসার সব দায়দায়িত্ব শেষে না তোমার ঘাড়েই চাপে।'

জবাবে হাসল মুসা। বলল, 'কতবড় দানব, দেখলে! এগুলোকেই ধরে ধরে

খায় ইনডিয়ানরা। ওরা আরও বড় দানব।'

হেসে উঠল ক্যাসাডো। 'স্বাদ কিন্তু ভালই। আমি খেয়ে দেখছি। ছোটগুলোর চেয়ে বড়গুলো অনেক বেশি টেস্টি। খাবে নাকি?'

মুসা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। বোঝা গেল খুব একটা অমত নেই। কিন্তু জিনা তাড়াতাড়ি দু-হাত নেড়ে বলল, 'না, বাবা, না, আমি নেই। সাপের গোস্ত! ওয়াক-থুহ!'

'মুসা, তোমার ইচ্ছে আছে মনে হচ্ছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'জন্তু-জানোয়ার ধরতে গেলে কখন কি খেতে হবে কে জানে?' মুসা বলল। 'সব সময় সঙ্গে খাবার না-ও থাকতে পারে। তখন তো জানটা বাঁচাতে হবে কোনমতে।'

কিশোর বলল, 'হারাম···'

'আরে ধ্যাত্তোর, হারাম। জান বাঁচানো ফরজ।'

'এ-তো দেখছি জাত অ্যানিমেল ক্যাচার হয়ে যাচ্ছে!' কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল জিনা।

পাল্টা জবাব দিল মুসা, 'ফাঁকি দিলে কোন কাজেই উন্নতি হয় না।'

হাসাহাসি করছে ছেলেরা, এই সময় হামুকে দেখা গেল। যোদ্ধাদের কারও কাছে কোন শিকার নেই। উদ্বিগ্ন, চোখেমুখে ভয়।

তাড়াহুড়ো করে মুখোশ পরে ফেলেছে ক্যাসাডো। লোজা তার কাছে এসে থামল হামু। প্রচুর হাত নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বলল কিছু। বেশির ভাগ শব্দই বুঝল না ছেলেরা।

ইংরেজিতে তাদেরকে জানাল ক্যাসাডো, 'হামু বলছে, শিকার মেলেনি। তার বদলে জঙ্গলের ভেতর দেখে এসেছে তাদের চিরশত্রু ট্রাকো ইনডিয়ানদের পায়ের ছাপ। ভয়াবহ যোদ্ধা ওরা। সুযোগ পেলেই অন্য গোত্রের ইনডিয়ানদের আক্রমণ করে বসে। সব সময় একটা যুদ্ধং-দেহী ভাব। কাজেই একেবারে চুপ, টুঁ শব্দ করবে না। হামু বলছে, এখন থেকে নড়াও উচিত হবে না, তাহলে টের পেয়ে যাবে ট্রাকোরা। ওরা নাকি একটা জাগুয়ারের পিছু নিয়েছে।'

কিন্তু ট্রাকোরা যে টের পেয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, বুঝতে পারেনি হামু। জিভারোদের পায়ের ছাপ দেখে ফেলেছে একজন ট্রাকো যোদ্ধা। হানুর দলের পিছু নিয়ে চলে এসেছে। বনের ভেতর তাদের সতর্ক নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে রাফিয়ানের। চাপা গলায় গাঁউ করে উঠল।

'চুপ!' তার কানের কাছে ধমক দিল জিনা নিচু স্বরে। 'চুপ থাক!'

ইশারায় কুলিদের চুপ থাকতে বলল হামু।

যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে সবাই। কুলিদের হাতেও লাঠি, বল্লম কিংবা তীর-ধনু।

'চায় কি ব্যাটারা?' কথা না বলে থাকতে পারল না মুসা।

'ওরা হয়তো ভাবছে, হামু কোন বড় শিকার পেয়েছে,' প্রায় শোনা যায় না, এমন ভাবে বলল ওঝা। 'ওটা ছিনিয়ে নিতে চায়। যখন দেখবে শিকার নেই, আমাদের সঙ্গে যা খাবার আছে লুট করে নিয়ে যাবে।'

'অবশ্যই যদি জিততে পারে,' রহস্যময় শোনাল কিশোরের কণ্ঠ।

তাদের যথাসর্বস্ব লুট করে নিয়ে যাবে ট্রাকোরা, আর তারা এই গহন বনে না খেয়ে মরবে, এটা ভাবতেই ভাল লাগছে না কিশোরের। ফন্দি আঁটছে সে মনে মনে। ফিফটি-ফিফটি চান্স যখন, ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

জিনার মুখ সাদা হয়ে গেছে। পুমকার আতঙ্কিত চেহারা দেখেই আন্দাজ করতে পারছে ট্রাকোরা কতটা ভয়ঙ্কর। মুসার দিকে তাকাল রবিন। দুজনের চোখেই ভয়। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে।

'মিস্টার ক্যাসাডো,' হাত বাড়াল কিশোর, 'আপনার মুখোশটা দিন। আর যোদ্ধাদের বলুন, ওদের মাথা থেকে কিছু পালক খুলে দিতে। জলদি!'

কেন চাইছে ওগুলো, বুঝতে পারল না ক্যাসাডো। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে মুখোশটা খুলে দিল। যোদ্ধাদেরকে বলতেই ওরাও পালক খুলে দিল।

তাদের কাছ থেকে কয়েকটা বিচিত্র মালা নিয়ে রাফিয়ানের গলায় পেঁচিয়ে বাঁধল কিশোর। মাথায় আটকে দিল জিভারোদের মাথার একটা বন্ধনী, তাতে কয়েকটা পালক লাগানো। নিজে পড়ল মুখোশটা। মাথায় পালক গুঁজল।

অবাক হয়ে দেখছে সবাই। সর্দার হামুও এই বিচিত্র সাজ দেখে স্তম্ভিত। করছে কি দেবতার ছেলে?

রাফিয়ানকে নিয়ে সামনে ছুটে গেল কিশোর, জঙ্গলের দিকে।

ঠিক ওই মুহূর্তে ঝোপ দু-হাতে ফাঁক করে বেরিয়ে এল দশ-বারোজন ট্রাকো, জিভারোদের আক্রমণ করার জন্যে। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না। কিশোর আর কুকুরটার দিকে চোখ পড়তেই পাথরের মত জমে গেল ট্রাকো-নেতা। লড়াইয়ের আগে চিৎকার করে যোদ্ধারা, একে বলে যুদ্ধ-চিৎকার। নেতাও ওরকম চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল, থেমে গেল মাঝপথেই। এমন অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে দেখেনি সে।

মুখোশটা ভীষণ ভারি, মাথা সোজা রাখতেই কষ্ট হচ্ছে কিশোরের, দম আটকে যাবে যেন। কিন্তু সে-সব পরোয়া না করে গলা ফাটিয়ে বিকট চিৎকার করে উঠল। সেই সঙ্গে হাত-পা নেড়ে নাচতে শুরু করল। নাচ মানে টারজান ছবিতে দেখা জংলী মানুষখেকোদের লাফঝাঁপের অবিকল নকল। মুখোশটা এক ধরনের অ্যামপ্লিফায়ারের কাজ করছে, ফলে কয়েক গুণ জোরাল শোনাল চিৎকার। সঙ্গে গলা মেলাল রাফিয়ান। তুমুল ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিল, সেই সঙ্গে তার বিশেষ নাচ—এক লাফে তিন হাত উঠে বাঁকা হয়ে আবার মাটিতে নামা। শুধু ইনডিয়ানরা কেন, এমন ফাল-নৃত্য জিনা, মুসা রবিন আর ক্যাসাডোও দেখেনি আর।

জিভারোরা চোখের পাতা ফেলতেও যেন ভুলে গেছে। তাদের চেয়ে বেশি

চেঁচাতে পারে দেবতার বাচ্চা, এই প্রথম জানল।

নাচতে নাচতে ট্র্যাকো-নেতার দিকে এগোল কিশোর। বার বার হাত ছুঁড়ছে তার দিকে। আঙুল নির্দেশ করছে, যেন কোন সাংঘাতিক বান মারতে যাচ্ছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'রাফি, যা ধর! দে ব্যাটাকে কামড়ে!'

এ-রকম অনুমতি কালেভদ্রে পাওয়া যায়, আর কি ছাড়ে রাফিয়ান? ঘেউ ঘেউয়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে দুই লাফে গিয়ে পড়ল নেতার সামনে। বিশাল হাঁ করে কামড় মারতে গেল তার পায়ের গোছায়।

চোখের পলকে ঘুরে গেল নেতা। কাণ্ড দেখে পিলে চমকে গেছে তার। রাফির কামড় খাওয়ার জন্যে দাঁড়াল না। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ঝোপের ধারে। তারপর দৌড়, লেজ তুলেই বলা যায়—কারণ, বিশেষ ওই অঙ্গটা থাকলে সত্যি সত্যি এখন খাড়া হয়ে যেত। এক ছুটে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

নেতারই এই অবস্থা, দলের অন্য যোদ্ধাদের আর দোষ কি। পড়িমড়ি করে দৌড় দিল ওরা নেতার পেছনে, যে যেদিক দিয়ে পারল। ঝোপঝাড় ভেঙে গিয়ে পড়ল বনের ভেতরে।

বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল মুসা। তার সঙ্গে যোগ দিল রবিন আর জিনা। ক্যাসাভোও হাসছে।

জিভারোরা হাসল না। দেবতার বাচ্চার ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে যেন। এক বিন্দু রক্তপাত না, কিছু না, তাড়িয়ে দিল ট্র্যাকোদের। খুব জোরাল কোন মন্ত্র নিশ্চয় পড়েছে, নইলে ট্র্যাকোদের মত হারামী মানুষ এভাবে পালায়?

এগিয়ে এসে কিশোরের সামনে দাঁড়াল হামু। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। তারপর নাচতে শুরু করল তার চারপাশে। দেখাদেখি অন্য যোদ্ধারাও এসে কিশোর আর রাফিয়ানকে ঘিরে নাচতে লাগল। তালে তালে নাড়ছে হাতের বল্লম আর তীর-ধনু। পুমকা নাচছে হাততালি দিয়ে দিয়ে।

নাচ থামল। মুখোশটা ক্যাসাভোকে ফিরিয়ে দিল কিশোর।

ক্যাসাভোও এমন ভঙ্গিতে হাতে নিল, যেন মুখোশটাতে মন্ত্র ভরে দিয়েছিল সে। কাজ শেষ হওয়ার পর ছুঁড়ে দেয়া মন্ত্র বাতাস থেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে মুখোশে ভরে তারপর মুখে লাগল।

জিভারোদের আর কোন সন্দেহ রইল না, ক্যাসাভোর মুখোশের মন্ত্রের জোরেই তাড়ানো হয়েছে ট্র্যাকোদের।

এবার সম্মান দেখানোর পালা।

জাগুয়ারের দাঁত গেঁথে তৈরি বিশেষ মালাটা গলা থেকে খুলে কিশোরের গলায় পরিয়ে দিল হামু। তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে লাল-হলুদ আলখেল্লার একটা কোণা সাবধানে ছোঁয়াল কপালে।

এই বার বিপদে পড়ল কিশোর। এই সম্মানের একটা জবাব দেয়া দরকার, জিভারোদের কায়দায়। দেবতার বাচ্চা এই রীতি জানে না, এটা হতেই পারে না,

মানবে না ইনডিয়ানরা। কিন্তু সেই রীতিটা কি? ভুল হলে কি খারাপ ভাবে নেবে ওরা? ভাবার সময়ও নেই। আস্তে করে হাত রাখল হামুর মাথায়। রেখেই বুঝল, ঠিক কাজটি করে ফেলেছে।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জিভারোরা। সর্দারকে আপন করে নেয়া মানেই তাদের সবাইকে আপন করা। দেবতার ছেলে তা-ই করেছে।

ইনডিয়ানদের উচ্ছ্বাস শেষ হলে এগিয়ে এল মুসা, রবিন আর জিনা। কিশোরের বুদ্ধির জন্যে তাকে ধন্যবাদ জানাল। রাফিয়ানকে জড়িয়ে ধরে আদর করল জিনা।

আর ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। সাহস সঞ্চয় করে আবার ফিরে আসতে পারে ট্র্যাকোরা। তল্পি-তল্পা গুছিয়ে রওনা দিল দলটা। অনেক ঘুরপথে পার হয়ে এল ট্র্যাকোদের এলাকা।

'এতে,' চিন্তিত হয়ে বলল রবিন, 'একটা অসুবিধে হতে পারে। আসল জায়গা পার হয়ে যদি চলে আসি?'

'আসতেও পারি,' কিশোর বলল। 'তবে পাহাড়-টাহার কিছু দেখিনি ওদিকে। পাহাড় না থাকলে উপত্যকা থাকবে না।'

'হ্যাঁ, তা-ও তো বটে।'

'আসল কথা হলো,' মুসা বলল, 'ভাগ্যের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে আমাদের। কপাল ভাল হলে জায়গাটা পাব, খারাপ হলে পাব না।

'আরও কত বিপদ আছে সামনে কে জানে।' জিনা বলল, 'জাগুয়ার গেল, সাপ গেল, ট্র্যাকো গেল। আর কি কি আছে এই জঙ্গলে?'

ও-ধরনের আর কোন বিপদের মুখোমুখি হলো না ওরা। তবে অসুবিধে অনেক হলো। শিকার খুবই সামান্য, ফলে খাবারে টান পড়ল। ইনডিয়ানদের বিশেষ অসুবিধে হলো না, তাদের সঙ্গে জাগুয়ারের মাংস রয়েছে। তবে নদীর ধার থেকে সরে আসার পর পানির কষ্ট দেখা দিল সকলেরই। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছে, পানি নেই, অথচ পরিশ্রম করতে হচ্ছে বেশি।

হাঁপিয়ে উঠেছে ছেলেরা, শরীর আর পারছে না। রাফিয়ান সারাক্ষণই জিভ বের করে হাঁপায়। তার ওপর আরও কষ্ট বেচারার—জোঁক আর রক্তচোষা কীট-পতঙ্গে ছেয়ে ফেলেছে শরীর। বেছে দেয় জিনা, তিন গোয়েন্দাও হাত লাগায়। কিন্তু কটা বাছবে? নিজেদের শরীর থেকে তাড়াতে তাড়াতেই অস্থির হয়ে উঠেছে।

পরদিন বিকেলে পুমকা বলেই ফেলল তার বাবাকে, ভালমত বিশ্রাম না নিলে সে আর চলতে পারবে না। বনের ছেলে সে, সে-ই যখন বলছে পারবে না, শহুরে ছেলেদের অবস্থা বোঝাই যায়।

থামার নির্দেশ দিল হামু।

জায়গায় জায়গায় আগুনের কুণ্ড জ্বালল যোদ্ধারা। রাতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করল।

এতই পরিশ্রান্ত, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল অভিযাত্রীরা। মনে হলো

ফুরুত করে শেষ হয়ে গেল রাতটা। তবে ভোরে চোখ মেলে পালকের মত হালকা মনে হলো সবার শরীর। বেশ ভাল বিশ্রাম হয়েছে।

নাস্তা খেয়ে রওনা হলো দলটা।

রোদ যত চড়ছে, গরম বাড়ছে। পানি নেই। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল সব্বাই।

ওঝার পরামর্শ চাইল হামু।

বিট্‌লাঙগোরগা বলল, চিন্তা নেই। আরেকটু এগিয়েই পানি পাওয়া যাবে। বলেছে সে আন্দাজে। সামনে উঁচু পর্বত দেখা যাচ্ছে, মাথায় বরফ। উপত্যকায় হ্রদ-টদ কিছু থাকতে পারে, এই ভরসাতেই বলেছে। জানে, ভুল হলে সর্বনাশ হবে। তার জাদু-ক্ষমতার ওপর ইনডিয়ানরা বিশ্বাস হারালে ভীষণ বিপদ হতে পারে।

তবে আপাতত বিপদ কেটে গেল।

পর্বতের তলায় একটা হ্রদ দেখা গেল দুপুর নাগাদ। রোদে ঝকমক করছে স্বচ্ছ পরিষ্কার পানি।

ছুটে গিয়ে জানোয়ারের মত উপুড় হয়ে পানিতে মুখ ডুবিয়ে দিল ইনডিয়ানরা। পেটভরে পানি খেয়ে, গায়ে মাথায় ছিটিয়ে উঠে এল।

ছেলেরা আর ক্যাসাডো খেল আঁজলা ভরে। খুব মিষ্টি। বোধহয় পর্বতের ওপরের বরফ গলা পানি ঝর্না বেয়ে এসে পড়ে এই হ্রদে।

হ্রদটা বেশি বড় না। বড় দিঘির সমান। কিশোরের মনে হলো, এটাই বোধহয় সেই জলাশয়, যেটার কথা বলা হয়েছে ধাঁধায়।

ঠিক দুপুর। সূর্য মাথার ওপরে।

ব্যাপারটা আগে চোখে পড়ল মুসার, তার দৃষ্টিশক্তি খুব জোরাল। 'দেখো দেখো! একেবারে মাঝখানে দেখা যাচ্ছে সূর্যটা। অদ্ভুত, না?'

অন্য ছেলেরাও দেখল।

'বোধহয় উঁচু জায়গায় রয়েছি বলেই দেখতে পাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'ভৌগোলিক আরেকটা ধাঁধা। যাকগে, ওটা নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। পশ্চিমে দেখো এখন, চাঁদ দেখা যায় কিনা?'

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল মুসা। মাথা নাড়ল, 'নাহ্ চাঁদ নেই।'

পকেট থেকে কম্পাস বের করল কিশোর। পশ্চিম কোনদিকে, দেখল। তার কাছে ঘেঁষে এসেছে জিভারোরা। চোখে কৌতূহল নিয়ে দেখছে।

'পশ্চিম ওদিকে,' হ্রদের অন্য পাড়ের ঘন জঙ্গলের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'এই দিনের বেলায় চাঁদ ওঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। যদি উঠতও, ওই জঙ্গলের জন্যে দেখা যেত না।'

'আমিও তাই ভাবছি,' রবিন বলল।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট!' বলে উঠল জিনা। 'ওই যে দেখো, ওইই যে,

ওদিকে।'

ক্যাসাডোও দেখেছে ওটা। হাত তুলে দেখাল।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল জিভারোরা, ওরাও দেখেছে। ঘন জঙ্গলের দিকে এতক্ষণ চেয়ে ছিল বলে দেখতে পায়নি।

তিন গোয়েন্দা দেখল, পশ্চিমে এক জায়গায় প্রায় পানির ভেতর থেকে উঠে গেছে হালকা ঝোপঝাড়। তার মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে মিটার চারেক উঁচু বাসনের মত গোল একটা বস্তু। মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সবুজ বনের মাঝে বিশাল এক মুক্তোর থালা যেন। দাঁড়িয়ে আছে লালচে পাথরের মঞ্চের ওপর।

গোল জিনিসটা কী, কি দিয়ে তৈরি, বুঝতে পারল না ছেলেরা।

ক্যাসাডোও পারল না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর, ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বুঝেছি। সূর্যের আলো।'

'সূর্যের আলো?' মুসা বুঝতে পারল না।

'বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ছোট ছোট আয়না বসানো রয়েছে চাকাটায়। সূর্যরশ্মি পানিতে প্রতিফলিত হয়ে গিয়ে পড়ছে আয়নাগুলোতে। তাতেই সৃষ্টি হয়েছে ওই কৃত্রিম চাঁদ। আশ্চর্য! এত শত বছর আগেও জানত?'

'কারা জানত? কী?' মুসার প্রশ্ন।

'যারা ওই চক্র বানিয়েছে। সূর্যের আলোতে যে চাঁদ আলোকিত হয়, জানত একথা?'

'হয়তো জানত,' রবিন বলল। 'হাজার হাজার বছর আগেই নাকি মানুষ জ্যোতির্বিদ্যায় উঁচু পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করেছিল। মিশরের পিরামিড, ইনকা-পিরামিড, স্টোনহেঞ্জ নাকি তারই স্বাক্ষর...'

'বুদ্ধি ছিল মানতেই হবে,' চক্রটার দিকে হাত তুলল মুসা। 'শুধু কাঁচ দিয়ে এত সুন্দর একটা জিনিস তৈরি করে ফেলল!'

'আমাদের দ্বিতীয় ধাঁধারও জবাব পেয়ে গেলাম।'

'হ্যাঁ,' রবিনের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এখন আইডলটা খুঁজে বের করতে পারলেই...'

'কেল্লা ফতে!' তুড়ি বাজাল মুসা।

দ্রুত জ্যোতি হারাচ্ছে কৃত্রিম চাঁদ। কারণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে সূর্য, হেলে পড়ছে বলে বিশেষ অ্যাঙ্গেলটা আর থাকছে না। খানিক পরে কোন জ্যোতিই রইল না আর চক্রটায়, অতি সাধারণ একটা পাথরের বাসন।

জিভারোদের দিকে ফিরে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিল ক্যাসাডো।

খুশিতে হল্লোড় করে উঠল ইনডিয়ানরা।

ক্যাসাডোর ওপর শ্রদ্ধা, ভক্তিতে গদগদ। হবেই। মুখোশের ক্ষমতায় শত্রু তাড়াতে পারে যে ওঝা, পানির হ্রদ হাজির করে দিতে পারে, যে গুপ্তধন এত

বছরেও কেউ পায়নি, সেটা পাওয়ারও ব্যবস্থা করতে পারে, তাকে ভক্তি না করে উপায় আছে।

ছেলেদের ওপরও ভক্তি বেড়েছে ওদের।

কাছে থেকে চাঁদটা দেখতে চলল কিশোর। সঙ্গে চলল মুসা, রবিন জিনা ও রাফিয়ান। পেছনে ক্যাসাডো, হামু আর তার দলবল।

'তারও পরে রয়েছে হলুদ দেবী,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে সবুজ চোখে।'

শুরুতে হালকা ঝোপঝাড়। কিন্তু খানিক পরে জঙ্গল এত ঘন হলো, পথ করে এগোনোর সাধ্য হলো না ছেলেদের। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে এল। আগে বাড়ল কয়েকজন যোদ্ধা। পথ কেটে কেটে এগোল।

তিনশো মিটার মত এগিয়ে হঠাৎ থেমে গেল ওরা। ক্যাসাডো আর ছেলেরা বুঝতে পারল, অবশেষে দেখা পাওয়া গেছে চন্দ্রমন্দিরের।

সামনে অদ্ভুত একটা বিল্ডিং। সাদা রঙ করা। সামনের দিকটা বিচিত্র—তৃতীয়ার চাঁদের আকার। চাঁদের ঠিক পেটের কাছে গোল বিরাট এক দরজা, ঢোকার জন্যে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অভিযাত্রীদের।

মন্দির দর্শনেই কুঁকড়ে গেল জিভারোদের মন। ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল ওরা, এগোতে সাহস করল না আর।

ছেলেদেরও বুক কাঁপছে। ঘন বনের ভেতরে ওই নির্জন এলাকায় এত পুরানো একটা বাড়ি দেখলে অতি বড় সাহসীরও গা ছমছম করবে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে অস্বস্তি তাড়াল যেন কিশোর। 'এসো, যাই। নিশ্চয় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন সবুজ-চোখো চন্দ্রদেবী।'

'আরেকটু ভদ্রভাবে সম্মানের সঙ্গে বলো,' নিচু স্বরে বলল মুসা, যেন দেবী সত্যিই শুনতে পাবে।

এগোতে যাবে ওরা, ডেকে থামাল ক্যাসাডো।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি?'

'ওই যে, দেখো।'

তিনটে ব্যাগ। প্রায় নতুন। মন্দিরের দরজার কাছেই মাটিতে পড়ে আছে।

'ইয়াল্লা!' চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'এ-তো সভ্য মানুষ! এখানে এসে ঢুকল কারা?'

'কি জানি?' হাত নাড়ল ক্যাসাডো। 'আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘাউ করে উঠে দৌড় দিল রাফিয়ান। এক ছুটে ঢুকে গেল গোল দরজা দিয়ে। স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে সময় লাগল জিনার। ডাকতে দেরি হয়ে গেল।

'রাফির হলো কি?' মুসা অবাক।

অবাক ক্যাসাডোও হয়েছে। 'ভয় পেল বলে তো মনে হলো না।'

'না, পায়নি,' জিনা বলল। 'চেনা কারও গন্ধ পেয়েছে।'

'অসম্ভব।' রবিন মাথা নাড়ল। 'হতেই পারে না। এখানে চেনা-জানা কে আসতে যাবে?'

'আন্দাজে কথা না বলে চলো না দেখি,' কিশোর বলল।

হাত তুলে জিভারোদের ডাকল ক্যাসাডো। ওরা কাছে এলে বলল, 'কাছাকাছি থেকো। আমরা ভেতরে যাচ্ছি। দরকার হলেই ডাকব। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়বে। ভয় পেয়ে পালিও না যেন।'

এবার নেতৃত্ব নিল ক্যাসাডো। খুব সাবধানে আগে আগে চলল সে, ছেলেরা পেছনে। দরজার কাছে পৌঁছে মুখোশটা খুলে হাতে নিল, একবার দ্বিধা করেই পা রাখল ভেতরে। অদৃশ্য হয়ে গেল।

দ্বিধা করল কিশোরও। 'চলো, আমরাও যাই। ওঁকে একা যেতে দেয়া ঠিক হবে না।'

ছেলেরাও ঢুকল মন্দিরে।

আলো খুব কম। ক্যাসাডোর গায়ে ধাক্কা লাগল মুসার। চোখে আলো সইয়ে নেয়ার জন্যে দরজার সামান্য ভেতরেই দাঁড়িয়ে গেছে বৈমানিক।

মন্দিরের দেয়ালের অসংখ্য ফুটো দিয়ে ম্লান আলো আসছে। আবছা আলো চোখে সয়ে এলে দেখল ওরা, বিশাল এক হলরুমে ঢুকেছে। অনেকটা জাহাজের খোলের মত লাগছে ঘরটা। এক সারি বিভিন্ন আকারের স্তম্ভ ঃ ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, ঠিক মাঝের স্তম্ভটার পর থেকে আবার ছোট হওয়া শুরু হয়েছে। কাস্তের মত বাঁকা মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছাত ঠেকা দিয়েছে স্তম্ভগুলো। দু-দিকে দুটো সিঁড়ি। একটা উঠে গেছে চাঁদের বাঁ প্রান্তের কাছে, আরেকটা ডান প্রান্তে। দুটো সিঁড়ির শেষ ধাপের ওপরে ছাতে গোল দুটো ফোকর।

বাঁ সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠে বাইরে মাথা বের করে দেখল কিশোর, ফোকরের বাইরে মস্ত বড় একটা চ্যাপ্টা পাথর ফেলে রাখা হয়েছে—বলির পাথর। নিশ্চয় নরবলি দেয়া হত ওখানে। পাশেই একটা মঞ্চ, পুরোহিত কিংবা ওঝা দাঁড়াতো হয়তো।

'শশশ্!' হুঁশিয়ার করল ক্যাসাডো। ডান সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, নেমে এল তাড়াতাড়ি। ওপরে শব্দ।

লুকিয়ে পড়ার আগেই উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল নিচে। ইংরেজিতে বলল কেউ, 'হলো তাহলে ঠিক। আমি তো ভাবলাম গেল টচটা।'

দশ

'ওরটেগা!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেছে।

দ্রুত নড়ল আলোটা। একে একে পড়ল পাঁচজনের ওপর।

'আরি, কাণ্ড দেখো!' বিশ্বাস করতে পারছে না ওরটেগা, 'ছেলেগুলো। সঙ্গে আরেকজন লোকও আছে!'

ডানের সিঁড়ি দিয়ে আরও দু-জন নেমে এল, চ্যাকো এবং জিম।

ক্যাসাডোই ওঝা বিট্‌লাঙ্গোরগা শুনে হেসেই বাঁচে না তিন হাইজ্যাকার।

'ভাল আছ, জিনা?' জিজ্ঞেস করল জিম। 'এসেছ, ভালই হলো। এক সঙ্গে যেতে পারব।'

'তারমানে যাননি আপনারা এখনও?' মুসা বলল। 'আমি তো ভাবছিলাম, আপনারা আমাদের উদ্ধার করতে ফিরে এসেছেন।'

'না, যেতেই পারিনি এখনও,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল জিম। 'জিভারোদের গাঁ থেকে পালিয়ে প্লেনে ফিরে গিয়েছিলাম। তাড়াহুড়ো করে তিনটে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। পথ হারিয়েছি পরের দিনই। চলে এসেছি এদিকে। মন্দিরটা দেখে ঢুকলাম। জানো, কি আবিষ্কার করেছি? এসো, দেখাই।'

ডানের ফোকর দিয়ে ছাতে বেরিয়ে এল ছেলেরা।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

একটা বেদীর ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বিরাট দেবী-মূর্তি, নিরেট সোনায় তৈরি। মাথায় সোনার মুকুটের সামনের দিকে রূপালী বাঁকা চাঁদ, রূপা দিয়ে বানিয়ে পরে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে মুকুটে। কাঁধে রূপার চাদরের শাল জড়ানো। আশ্চর্য দুটো চোখ, সবুজ দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

'পান্না,' ওরটেগা বলল। 'খুলে নেব। ভাল দাম পাওয়া যাবে রিওতে।'

একটা ছুরি বের করে মূর্তিটার দিকে এগোল সে।

তাকে থামাল ক্যাসাডো। 'এক মিনিট। আমরা এখানে কি করে এলাম, জিজ্ঞেস করেননি। আগে শুনুন, তারপর পান্না খুলবেন।'

খুলে বলল সব ক্যাসাডো। 'মূর্তিটা হামুকে দিয়ে দিলে,' কথা শেষ করল সে, 'আমাদের মুক্তি দেবে। সবাই আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব।'

হেসে উঠল চ্যাকো, বিশ্রী শোনাল হাসিটা। 'জিভারোরা জানছে কি করে মূর্তিটা ছিল এখানে? পেছনে আরেকটা ছোট দরজা আছে, চোখ দুটো নিয়ে বেরিয়ে যাব আমরা, ঢুকে পড়ব জঙ্গলে। ওরা দেখবেও না, জানবেও না কিছু।'

'কিন্তু দরজার বাইরে যে ব্যাগ পড়ে আছে?' রবিন প্রশ্ন তুলল।

'জাহান্নামে যাক ব্যাগ। ওগুলোর মধ্যে তেমন কিছু নেই। ওরটেগা, জলদি খোলো।'

ওরটেগার হাত চেপে ধরল ক্যাসাডো। 'পাগল হয়েছেন! শুনুন, মূর্তিটা অক্ষত অবস্থায় হামুকে দিতে হবে। নইলে সে কোনদিনই আমাদের যেতে দেবে না।'

'আপনাদের কথা কে ভাবছে?' ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল চ্যাকো। 'আমি চাই টাকা।'

চুপ করে ছিল জিম। বলল, 'চ্যাকো, জিভারোদের হাত থেকে পালাতে পারবে

না। সহজেই ওরা ধরে ফেলবে। এই জঙ্গল থেকে বেরোতেই যদি না পারো, টাকা পাবে কিভাবে? তার চেয়ে ক্যাসাডো যা বলছে, শোনো। আমাদের সবারই মঙ্গল তাতে।'

কিন্তু চ্যাকো তখন অন্ধ। তার পক্ষ নিল ওরটেগা। মহামূল্যবান পান্না দুটো তাদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কতখানি বিপদে রয়েছে, আরও কতখানি বাড়বে, বুঝতেই চাইছে না।

ক্যাসাডোও নাছোড়বান্দা। কিছুতেই পান্না খুলতে দেবে না।

কথা কাটাকাটি, শেষে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। ক্যাসাডোকে ঘুসি মেরে বসল চ্যাকো।

ওকে এমনিতেই পছন্দ করে না রাফিয়ান। তার ওপর ক্যাসাডোকে মারায় মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তার। ঝাঁপিয়ে পড়ল চ্যাকোর ওপর। টুঁটি কামড়ে ধরতে গেল।

বিকট চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল চ্যাকো। কুকুরটা উঠে এল তার বুকের ওপর।

চেঁচিয়ে থামতে বলছে জিনা, কিন্তু কানেও ঢুকছে না রাফিয়ানের। রোখ চেপে গেছে তার। চ্যাকোর রক্ত না দেখে ছাড়বে না।

চেঁচামেচি শুনে জিভারোরা ভাবল, তাদেরকে ডাকা হচ্ছে। হুড়মুড় করে এসে ঢুকল ভেতরে। দুপদাপ করে উঠে এল ছাতে।

হামু বোকা নয়। কুসংস্কারে বিশ্বাসী বটে, কিন্তু মগজটা তার পরিষ্কার। সোনার দেবী-মূর্তি, ওরটেগার হাতে ছুরি, দেবীর চোখের কাছে আঁচড়, কিছুই চোখ এড়াল না তার। বুঝে ফেলল, কি হচ্ছে।

সর্দারের নির্দেশে নিমেষে তিন হাইজ্যাকারকে কাবু করে ফেলল জিভারোরা। হাত পিছমোড়া করে শক্ত করে বাঁধল বুনো লতা দিয়ে।

জিমকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেও লাভ হলো না। এত রেগে গেছে হামু, কারও কথাই শুনল না, এমনকি ওঝার কথাও নয়। সাংঘাতিক অপরাধ করেছে তিন বন্দী। গ্রাম থেকে পালিয়েছে, তারপর এখানে এসে দেবীর চোখ চুরি করতে চেয়েছে। ওদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সেখানেই ঘোষণা করল হামু, গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে আগামী পূর্ণিমাতেই তিনজনকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে। এটাই ওদের যোগ্য শাস্তি।

যে জিনিসের জন্যে এসেছিল, পাওয়া গেছে, গাঁয়ে ফেরার জন্যে তৈরি হলো দলটা। ছেলেদেরকে আর ক্যাসাডোকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, কথা রেখেছে হামু। বলল, যখন যেখান থেকে খুশি স্বর্গে ফিরে যেতে পারে। বাধা দেয়া হবে না।

কিন্তু তিন হাইজ্যাকার আবার ধরা পড়ায় আনন্দ মাটি হলো ছেলেদের। তিনজনকে জিভারোদের হাতে রেখে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না ওরা।

'আমাদেরও গাঁয়ে-ফিরে যেতে হবে,' বলল ক্যাসাডো। 'কিছু দিন বিশ্রাম

দরকার। নইলে আবার জঙ্গল পাড়ি দিতে পারব না। তাছাড়া সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ওই তিন ব্যাটা। ছাড়ানোর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আগামী পূর্ণিমার দিন বলি দেবে ওদেরকে হামু, মাঝে বেশ কিছুদিন সময় আছে। আশা করি একটা উপায় করে ফেলতে পারব।'

গাঁয়ে ফিরে চলল সবাই।

সোনার মূর্তিটা পালা করে বইল দু-জন যোদ্ধা, মহা-সম্মানের কাজ মনে করল এটাকে ওরা।

গাঁয়ে ফিরে তিন হাইজ্যাকারকে কুঁড়েতে ভরল জিভারোরা। অনেক পাহারাদার রাখা হলো, আর যাতে পালাতে না পারে। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা হলো।

ছেলেদের ওপর কেউ আর চোখ রাখছে না এখন। যখন যেখানে খুশি যেতে পারে তারা। ক্যাসাডোও মুক্ত। আলাদা আলাদা কুঁড়েতে না শুয়ে একই কুঁড়েতে রাত কাটায় এখন। ফলে আলাপ-আলোচনার সুবিধে হলো।

'কিন্তু উপায়টা কি এখন?' প্রশ্ন করল জিনা।

'আমারও তাই জিজ্ঞাসা,' জবাব দিল বৈমানিক। 'ভাবতে ভাবতে তো মগজ ঘোলা করে ফেললাম, কোন উপায় দেখছি না। ব্যাটাদের ছাড়াই কি করে?'

চুপ করে রইল সবাই।

'দেখি, কি করা যায়!' আবার বলল ক্যাসাডো। 'তবে আগে প্লেনে যেতে হবে একবার। এস ও এস পাঠাতে। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত পাঠিয়েই যাব। এখন আর ভয় নেই, আমি দিনের পর দিন না থাকলেও কেউ খোঁজ করবে না।'

ভাগ্য যখন ভাল হতে শুরু করে, সব দিক থেকেই হয়। সেদিন দ্বিতীয়বারের চেষ্টায়ই জবাব পেয়ে গেল ক্যাসাডো। খুশিতে লাফাতে লাফাতে গাঁয়ে ফিরে এল সে।

ঘুম থেকে ছেলেদের ডেকে তুলে জানাল খবরটা। 'পেয়েছি! কাঠ-ব্যবসায়ী কোম্পানির এক দল লোক কাজ করছে বনে। তারাই ধরেছে সিগন্যাল। বলেছে, ব্রাজিল পুলিশকে জানাবে, যত তাড়াতাড়ি পারে। দশ-বারো ঘণ্টা পরে আবার যাব প্লেনে। খবর নেব, কদ্দুর কি হলো। যাক, দুঃস্বপ্ন শেষ হতে চলেছে এতদিনে।'

'সময় মত সাহায্য এলেই হয় এখন,' কিশোর বলল। 'পূর্ণিমার আর মাত্র ছয় দিন বাকি।'

সে-কথা ক্যাসাডোর মনে আছে, কিন্তু উপায় এখনও বের করতে পারেনি।

ভাল ঘুম হলো সে-রাতে। ঝরঝরে শরীর মন নিয়ে পরদিন সকালে উঠল অভিযাত্রীরা।

নাস্তা সেরেই প্লেনে চলে গেল ক্যাসাডো।

'ছ-দিনের মধ্যে কি সাহায্য আসবে?' রবিনের প্রশ্ন। 'কিশোর?'

'জানি না।'

'না এলে লোকগুলোকে বাঁচানো যাবে না,' মুসা বলল।

অনেক মাথা ঘামাল ওরা, কিন্তু কোন উপায় বেরোল না। তিন হাইজ্যাকারের কপালে বলিই লেখা আছে বোধহয়।

সন্ধ্যায় ফিরে এল ক্যাসাডো। মুখ উজ্জ্বল। 'এতক্ষণে সারা দুনিয়া জেনে গেছে আমাদের খবর।'

চকচকে চোখে সমস্ত শুনল ছেলেরা।

'চার দিনের মধ্যেই আর্মি হেলিকপ্টার আসবে আমাদের নিতে,' বলল ক্যাসাডো। কপ্টার নামার জন্যে একটা ল্যাণ্ডিং প্যাড বানিয়ে ফেলতে হবে আমাদের। সেটা কোন ব্যাপারই না। জিভারোদের দেখিয়ে দিলেই বানিয়ে ফেলতে পারবে। দেবতার ক্যানু নামবে শুনলে খুব আগ্রহ করে কাজ করবে।'

'তা-তো হলো,' জিনা বলল। 'তিন হাইজ্যাকারের কি হবে?'

হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ক্যাসাডোর। 'সরি, জিনা, ওদের জন্যে কিছু করতে পারছি না। মিলিটারিকে বললে বল প্রয়োগ করবে, তাতে জিভারোদের সঙ্গে লড়াই অনিবার্য। তখন তোমরাও আহত হতে পারো। তিনটে আসামীর জন্যে সে রিস্ক আমি নিতে পারব না।'

'আমাদের নামিয়ে দিয়ে তো ফিরে আসতে পারবে?'

'মনে হয় না। আমাদের যেতেই অনেক সময় লাগবে। তার পর ফিরে আসতে আসতে বলি শেষ হয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপার আছে। ব্রাজিলিয়ান কর্তৃপক্ষ সহজে উপজাতীয়দের সঙ্গে বিরোধে যাবে না। এমনিতেই বশ্যতা মানতে চায় না ওরা, তার ওপর গোলাগুলি চললে আরও খেপে যাবে। ভাল মানুষ হলে কথা ছিল, তিনটে ক্রিমিন্যালের জন্যে কেন ওদের খেপাতে যাবে সরকার?'

সবাই বিষণ্ণ। রাফিয়ানও বুঝতে পারছে, আনন্দের সময় নয় এটা। লেজ নিচু করে রেখেছে সে, কান ঝুলে পড়েছে। চুপচাপ বসে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

'কিন্তু এভাবে তিনটে মানুষকে জবাই করে ফেলবে,' কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না জিনা, 'আর আমরা কিছুই করতে পারব না?'

সে-রাতে কেউ ঠিক মত ঘুমাতে পারল না।

শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবল কিশোর। কি যেন একটা মনে আসি আসি করেও আসছে না, ধরতে পারছে না সে। ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল, ভেঙে গেল খানিক পরেই। লাফিয়ে উঠে বসল সে। বাইরে তখন ভোরের আলো। ডাকল সবাইকে।

'কি ব্যাপার, কিশোর?' চোখ রগড়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'পথ পেয়ে গেছি।'

'কিসের পথ?'

'ওদের বাঁচানোর।'

ঘুম দূর হয়ে গেল মুসার চোখ থেকে। অন্যেরাও সতর্ক। কিশোর কি বলে

শোনার জন্যে অধীর।

'কাজটা সহজ হবে না,' কিশোর বলল। 'মিস্টার ক্যাসাভো, আপনার সহায়তা দরকার। ওরটেগাকেও খাটতে হবে।'

'ওরটেগা?' ক্যাসাভো অবাক।

'হ্যাঁ। সে ভেনট্রিলোকুইজম জানে।'

'তাতে কি?' ক্যাসাভোর বিস্ময় বাড়ল। কিছুই বুঝতে পারছে না। 'খুলে বলো।'

'বুঝতে পারছেন না? ধরুন, আরেকবার কথা ছুঁড়ে দিল ওরটেগা। কথাটা বেরোল চন্দ্রদেবীর মুখ দিয়ে…'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলল ক্যাসাভো। 'ঠিক বলেছ! ঠিক! সহজেই বোঝাতে পারব হামুকে। দেবীকে অপমান করছে যারা তাদের বিচার দেবীই করুক, রায় দিক। তারপর…তারপর আমি মূর্তিটাকে প্রশ্ন করব, সে জবাব দেবে… চমৎকার! কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস।'

'এখনই এত শিওর হবেন না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'জিভারোরা ইংরেজি জানে না। ওরটেগাও এদের ভাষা জানে না। কথা হবে কোন্ ভাষায়?'

'ওটা এমন কিছু কঠিন না,' ক্যাসাভো বলল। 'জিভারো ভাষায় শব্দ খুবই কম, উচ্চারণও খুব সহজ, তা এতদিনে নিশ্চই বুঝেছ। তাছাড়া প্রশ্ন ঠিক করব আমি, জবাবও। সেই জবাবই মুখস্থ করাব তাকে।'

খুশি হলো সবাই। যত শত্রুতাই করুক, তিনজন মানুষকে বলি দেয়া হবে চোখের সামনে, এটা সহ্য করা যায় না।

সময় নষ্ট করল না ক্যাসাভো। তখুনি গেল হামুর কাছে।

সহজভাবেই মেনে নিল হামু। দেবতা কালুম-কালুম তার দেবীর অপমান হতে দেখেছে, প্রতিশোধ তো নিতেই চাইবে। আর দেবীর বিচার দেবীই করুক, এটা চাওয়াটাও যুক্তিসঙ্গত। হামু কেন মাঝখান থেকে উল্টোপাল্টা বিচার করে দেবতার কুনজরে পড়তে যাবে?

এক সঙ্গে দুটো কাজ করার হুকুম দিল সে তার লোকজনকে।

দেবতাদের উড়ুক্কু-নৌকা নামার জন্যে 'মঞ্চ' বানানোর নির্দেশ দিল। আরেকটা উঁচু ছোট মঞ্চ বানাতে বলল তার কুঁড়ের সামনে, ওটাতে দেবীকে রাখা হবে। ওখান থেকেই বিচার করবে দেবী।

দেবীর মঞ্চ বানাতে বেশি সময় লাগল না।

খুব ধুমধাম করে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান সেরে দেবীকে মঞ্চে তুলল ওঝা বিট্‌লাঙগোরগা। গাঁয়ের সবাই এসে ভক্তি-ভরে প্রণাম করে গেল দেবীকে।

এরপর অপেক্ষার পালা। কবে আসবে সেই শুভক্ষণ, যখন তিন বন্দির বিচার করবে দেবী। সময়টা ওঝা ঠিক করবে।

খুব বেশি সময় নেয়া যাবে না। ওরটেগাকে ভাষা শেখাতে শুরু করল

ক্যাসাডো। তবে জিভারোদের অলক্ষে। সে ওঝা। বন্দিদের কুঁড়েতে তার যাতায়াত কেউ সন্দেহের চোখে দেখল না।

অবশেষে এল সেই দিন।

সকাল থেকেই খুব উত্তেজনা। বিভিন্ন কারণে সবাই উত্তেজিত। গাঁয়ের লোক, তিন গোয়েন্দা, জিনা, বন্দিরা, সবাই।

মঞ্চের সামনে এসে জড় হলো সব লোক। সকালের সোনালী রোদে ঝকঝক করে জ্বলছে চন্দ্রদেবী। নিজের কিরণ ছড়িয়ে দিয়ে স্ত্রীর ঝলমলে রূপকে শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে যেন তার স্বামী 'সূর্যদেবতা'। ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করতে লাগল ইনডিয়ানরা।

মঞ্চে দেবীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওঝা। যতরকম মালা আর সাজপোশাক আছে, সব আজ গায়ে চাপিয়েছে। সব চেয়ে বিকট চেহারার মুখোশটা পরেছে। অপার্থিব লাগছে তাকে, ভয়ঙ্কর।

ঢিবঢিব করছে ছেলেদের বুক। হবে তো? কাজ হবে?

মঞ্চের পাশে বিশেষ আসনে বসেছে হামু, দু-পাশে আর সামনে বসেছে তার পরিবারের লোকজন। তাদের কাছেই সম্মানজনক দূরত্বে সম্মানিত আসনে বসেছে তিন গোয়েন্দা আর জিনা। জিনার পাশে রাফিয়ান, গম্ভীর হয়ে আছে। বুঝতে পেরেছে, এটা ঘেউ ঘেউ কিংবা হালকা কিছু করার সময় নয়। ফিসফাস কানাঘুষা করছে গাঁয়ের লোক ঃ স্বর্গের কুকুর তো, দেখো, কেমন ভাবভঙ্গি! দেবতার চেয়ে কম কি?

হাত তুলে ইশারা করল হামু।

পলকে থেমে গেল সমস্ত শব্দ।

আবার ইশারা করল সর্দার।

কয়েকজন যোদ্ধা গিয়ে বন্দিদের নিয়ে এল।

চ্যাকোর চেহারা ধসে গেছে। জিম আর ওরটেগা মোটামুটি ঠিকই আছে।

তিন বন্দিকে উদ্দেশ্য করে লম্বা বক্তৃতা দিল ওঝা। ওরটেগা কিছু কিছু বুঝল, অন্য দু-জন কিছুই বুঝল না। তবে ছেলেরা বুঝল বেশির ভাগই।

ঘন ঘন হাততালিতে ফেটে পড়ল জনতা। আরেকবার দেবীকে প্রণামের ধুম পড়ে গেল।

হাত তুলল বিট্‌লাঙগোরগা।

নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল।

বন্দিদের আরও কাছে আসার ইশারা করল ওঝা।

সময় উপস্থিত। সবাই উত্তেজিত। চোখ মঞ্চের দিকে।

জনতা যাতে শুনতে পায় সে জন্যে চেঁচিয়ে বলল ওঝা, 'হে সম্মানিত দেবী, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা?'

ছেলেদের বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেল। ঠিকমত বলতে পারবে তো ওরটেগা?

পণ্ড করে দেবে না তো সব?

হঠাৎ শোনা গেল কথা, কাঁপা কাঁপা কথা। পুরুষ কণ্ঠ, না মহিলা, বোঝা গেল না। মনে হলো, দেবীর অনড় ঠোঁটের কাছ থেকেই এল কথাগুলো : হ্যাঁ, শুনছি!

অস্ফুট শব্দ করে উঠল জনতা, শব্দের একটা শিহরণ বয়ে গেল যেন। শ্রদ্ধায় আপনাআপনি মাথা নিচু হয়ে গেল জিভারোদের।

'হে সম্মানিত দেবী,' আবার বলল ওঝা, 'ওই তিনজন মানুষকে চিনতে পারছেন?'

জবাব এল : *নিশ্চয় পারছি!* রাগান্বিত মনে হলো দেবীর কণ্ঠ।

পরস্পরের দিকে তাকাল ছেলেরা। ভালই অভিনয় করছে ওরটেগা। উতরে যাবে মনে হচ্ছে।

ওঝা বলল, 'সর্দার হামু তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চায়। আপনিও কি তাই চান?'

জবাব : *নিশ্চয়। মৃত্যুদণ্ডই তাদের একমাত্র শাস্তি।*

চমকে উঠল ছেলেরা। বলে কি ওরটেগা? দিল নাকি সব গড়বড় করে?

ভাবার সময় পেল না, তার আগেই শোনা গেল আবার ওঝার প্রশ্ন, 'মৃত্যু কিভাবে হবে তাদের বলুন, হে সম্মানিত দেবী।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। মনস্থির করে নিচ্ছে যেন দেবী। জিভারোদের উত্তেজনা চরমে, নিশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে তারা।

অবশেষে শোনা গেল দেবীর রায় :

স্বর্গে গিয়ে হবে তাদের মৃত্যু। দেবতা কালুম-কালুম নিজের হাতে বলি দেবেন তাদের। প্রচণ্ড ঝড় বইবে তখন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। পাপীর ধ্বংস হবে, দেবতার পূজারিরা হবে পুরস্কৃত। তিন বন্দিকে সঙ্গে করে স্বর্গে নিয়ে যাবেন ওঝা বিটলাঙগোরপা।

রায় শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল ইনডিয়ানরা। কি সাংঘাতিক পাপী ওই তিনজন। দেবতা নিজের হাতে বলি দেবেন, তার মানে মৃত্যুর পরেও তাদের পাপ মোচন হবে না, নরকে জ্বলেপুড়ে মরবে। হাজার রকম শাস্তি পাবে।

তাছাড়া দেবী বলেছেন, সেদিন পাপীরা ধ্বংস হবে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল জিভারোরা। দেবীকে বার বার প্রণাম করল। 'বাঁচাও দেবী,' 'তোমার পাপী বান্দাকে ছেড়ে দাও কালুম-কালুম,' এমনি নানারকম গুঞ্জন।

হাত তুলল ওঝা।

চুপ হয়ে গেল গুঞ্জন।

'রায় দিয়েছেন দেবী,' বলল ওঝা। 'সবাই শুনেছ?'

চিৎকার করে জানাল সবাই, শুনেছে।

হামু বলল, 'সম্মানিত বিটলাঙগোরপা, কালুম-কালুমের আদেশ তো শুনলে। বন্দিদেরকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে?'

'নিশ্চয়,' বলল ওঝা। 'দেবতার আদেশ অমান্য করতে পারি? সর্দার হামু, তোমার দেবভক্তির কথা সব আমি বলব কালুম-কালুমকে।'

খুব খুশি হলো সর্দার। বলল, 'আমার গাঁয়ের কথাও বোলো, বিট্‌লাঙগোরগা। আমি কথা দিচ্ছি, যারা এখনও খারাপ আছে, তারা ভাল হয়ে যাবে। কালুম-কালুম যেন শাস্তি না দেন।'

ওঝা বলল, 'বলব।'

সর্দার আর ওঝার বদান্যতায় খুশি হলো জনতা। শতমুখে তারিফ করতে লাগল দু-জনের।

আরও বিমর্ষ মনে হলো তিন বন্দিকে। ভেতরে ভেতরে আসলে পুলকে ফেটে পড়ছে, কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দিল না।

উল্লাস ঢেকে রাখতে খুব কষ্ট হলো ছেলেদের।

আবার অপেক্ষার পালা। কবে আসে হেলিকপ্টার? জিভারোরা অপেক্ষায় রয়েছে কবে নামবে দেবতার উড়ুক্কু-নৌকা?

অবশেষে এল সেই দিন।

ছেলেরা সবে নাস্তা শেষ করেছে, এই সময় শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। কপ্টারের শব্দ তাদের কানে এত মধুর শোনায়নি আর কখনও। তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

একের পর এক নামতে লাগল হেলিকপ্টার।

জিভারোদের চোখে ভয় মেশানো কৌতূহল। এমন আজব নৌকা এই প্রথম দেখছে। অতি দুঃসাহসী দু-একজন কাছে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু রোটর ব্লেডের জোরাল বাতাস গায়ে লাগতেই পিছিয়ে গেল, যতখানি না ধাক্কায়, তার চেয়ে অনেক বেশি, ভয়ে ভক্তিতে। এই বাতাস তাদের বিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিল শতগুণ। ধরেই নিল, কালুম-কালুম অদৃশ্য ভাবে কাছেই রয়েছেন। তিনি বাতাসের দেবতা, শরীর অদৃশ্য রেখেছেন বটে, কিন্তু বাতাস সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছেই। হেলিকপ্টারগুলোকে এক দফা প্রণাম করে নিল জিভারোরা।

এক সারিতে এগিয়ে গেল স্বর্গবাসীরা, তাদের পেছনে জিভারোদের দীর্ঘ মিছিল। একে একে কপ্টারে উঠল ছেলেরা। আরেকটা কপ্টারে তোলা হলো তিন বন্দিকে। ওঠার সময় এমন ভান করল ওরা, যেন যেতে চায় না।

'চাইবে কেন?' ভাবল জিভারোরা। 'বলির গুয়োর হতে কে যেতে চায়?'

বাকি রইল বিট্‌লাঙগোরগা।

হামুকে কাছে আসার ইশারা করল সে।

এল সর্দার। চোখ ছলছল। ওঝাকে ভালবেসে ফেলেছিল।

মুখোশ খুলে বাড়িয়ে দিল ক্যামেরা, 'নাও, এটা তোমাকে উপহার দিলাম। এটা দেখে আমাকে মনে কোরো।'

চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারল না সর্দার। গাল বেয়ে গড়িয়ে নামল।

ওমার একটা হাত আলগোছে তুলে নিয়ে উল্টো পিঠে চুমু খেল। ধরা গলায় বলল, 'স্বর্গে গিয়ে আমাকে ভুলে যেও না, বিটলাগুগোরগা।'

কপ্টারে উঠল ক্যাসাডো।

এক এক করে আকাশে উঠতে লাগল কপ্টারগুলো।

বকের মত গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছে জিভারোরা।

খোলা দরজা দিয়ে হাত বের করে নাড়ল কিশোর। ঠিকই চিনতে পারল পুমকা। জবাবে সে-ও নাড়ল। জিভারোরা বুঝল, এটা স্বর্গবাসীদের বিদায় সঙ্কেত। তারাও হাত নাড়তে শুরু করল।

খারাপ লাগল কিশোরের, সহজ-সরল মানুষগুলোকে এভাবে ধোঁকা দিয়ে এসেছে বলে। কিন্তু এছাড়া আর করারই বা কি ছিল?

রোদে ঝকমক করছে সোনার মূর্তিটা, ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়।

সবুজ বনের উপর দিয়ে উড়ে চলল হেলিকপ্টার।

'ইস্, কি একখান অ্যাডভেঞ্চারই না করে এলাম,' বলল মুসা।

কিশোর আর রবিন জবাব দিল না, জিভারোদের কথা ভাবছে।

জিনা বলল, 'হ্যাঁ, অনেক দিন মনে থাকবে।'

'হুউ!' করে সায় জানাল রাফিয়ান।

এগারো

একটা সামরিক বিমানক্ষেত্রে নামল হেলিকপ্টার।

কপ্টার বদল করল অভিযাত্রীরা। আরেকটা বেসামরিক বিমান বন্দরে নিয়ে গেল তাদেরকে বেসামরিক হেলিকপ্টার। ওখান থেকে ছোট বিমানে করে ম্যানাও। ম্যানাও থেকে যাত্রীবাহী বড় বিমানে করে পৌঁছল রিও ডি জেনিরোতে।

সঙ্গে সঙ্গে বিমানটাকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। তিন গোয়েন্দা আর জিনা নামল রাফিয়ানকে নিয়ে, ক্যাসাডো নামল। তিন হাইজ্যাকারকে সারা পথ পাহারা দিয়ে এনেছে মিলিটারি পুলিশ। রিও ডি জেনিরোর পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে গেল তারা।

ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরতে ছুটে এলেন চার জোড়া দম্পতি। কিশোরের চাচা-চাচী, রবিন, মুসা আর জিনার বাবা-মা, সবাই এসেছেন। যেদিন শুনেছেন ছেলেদের খবর পাওয়া গেছে, সেদিনই ছুটে এসেছেন ব্রাজিলে।

ক্যাসাডোর জন্যেও অপেক্ষা করছে উষ্ণ সম্বর্ধনা। অ্যাভিয়েশন ক্লাবের লোক, তার কিছু বান্ধবী আর বন্ধুবান্ধব এসেছে তাকে স্বাগত জানাতে। মৃত ধরে নিয়েছিল যাকে, জ্যান্ত হয়ে সে আবার ফিরে এসেছে, আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল কেউ কেউ।

বিমান বন্দরের লাউঞ্জে ঢুকতেই ছেঁকে ধরল রিপোর্টাররা। ছবির পর ছবি

তোলা হলো। প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো অভিযাত্রীদের। শেষে পুলিশকে এসে উদ্ধার করতে হলো।

আরও দিন কয়েক রিও ডি জেনিরোতেই থাকতে হলো ওদের।

তিন হাইজ্যাকারের বিচার শুরু হয়েছে। সাক্ষি দিতে হবে।

ছেলেদের সাক্ষ্যে শাস্তি হালকা হয়ে গেল জিমের। তাকে অল্প কিছুদিনের জেল দিলেন বিচারক। লম্বা জেল হলো ওরটেগা আর চ্যাকোর।

কিন্তু ওরা কিছু মনে করল না। অপরাধ করেছে, শাস্তি পেয়েছে। তিনজনেই দেখা করতে চাইল তিন গোয়েন্দা আর জিনার সঙ্গে।

দেখা করল ওরা।

জিভারোদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে বার বার ওদের ধন্যবাদ দিল হাইজ্যাকাররা।

জিম কথা দিল, জেল থেকে বেরিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবে। ভাল হয়ে যাবে। অপরাধের পথে পা বাড়াবে না আর কোনও দিন।

জেলখানা থেকে ফেরার পথে মুসা বলল, 'কিশোর, আবার বোধহয় আমাদের জঙ্গলে যেতে হবে। আমাজনের জঙ্গলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'বোধহয়।'